হৃদয় গলে সিরিজ-৭৪

দ্বিতীয় আয়োজন-২৪

আপনার প্রশ্নের জবাব

২

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

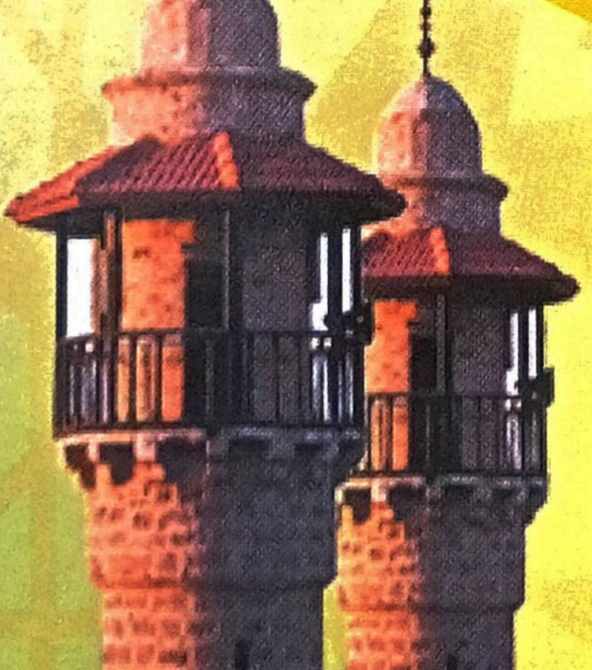

হৃদয় গলে সিরিজ-৭৪

আপনার প্রশ্নের জবাব-২

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

এম. এ. (ফার্স্ট ক্লাস, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

দাওরায়ে হাদীস (ফার্স্ট ক্লাস, বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড)

শিক্ষক, নূরিয়া ইসলামিয়া মাদরাসা, সাটিরপাড়া, বকুলতলা, নরসিংদী

সম্পাদনায়

মাওলানা হাবীবুর রহমান নদভী

শিক্ষক, মাদরাসাতুল মাদীনাহ, ঢাকা

অনুবাদক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুত তাকওয়া

১১/১ ইসলামী টাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড), দোকান নং-২১

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

আপনার প্রশ্নের জবাব-২

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম
০১৯২৩-২২৯০৯৬, ০১৭১২-৭৯২১৯৩
E-mail : mofizul.islam30@gmail.com
Web : redoygoleseris.blogspot.com

প্রকাশক

ইবনে শামস

০১৯৬২-৪১৫০৭০

প্রকাশকাল

এপ্রিল-২০১৪ ইংরেজী

জুমাদাস সানী-১৪৩৫ হিজরী

প্রচ্ছদ

মুনীর সাআদাত

মূল্য

একশ টাকা মাত্র

Apnar Prosner Jobab--2. By Mawlana Mohammad Mofizul Islam. Edited by Mawlana Habibur Rahman Nadabi. Published by Maktabatot Taqwa, Banglabazar, Dhaka-1100.

উপহার

শ্রদ্ধেয়/স্নেহের..

....

....কে

আপনার প্রশ্নের জবাব-২ বইখানা

আন্তরিকতার নিদর্শনস্বরূপ

উপহার দিলাম

শুভেচ্ছান্তে

স্বাক্ষর : ....

তারিখ : ....

পরবর্তী বই

যে গল্পে অশ্রু ঝরে-২

অর্পণ

হৃদয় গলে সিরিজের
সম্মানিত পাঠক-
পাঠিকাদের
হাতে।

— মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

দারুল উলূম মাদানী নগর মাদরাসার স্বনামধন্য মুহাদ্দিস,
আরবী ভাষার প্রখ্যাত আদীব ও গবেষণামূলক
বহু গ্রন্থপ্রণেতা হযরত মাওলানা সফিউল্লাহ
ফুআদ সাহেব দা. বা.-এর মূল্যবান

অভিমত ও দোয়া

বন্ধুবর মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম সাহেবের হৃদয় গলে সিরিজের কয়েকটি বই আমি দেখেছি। বইগুলোতে যে সকল ঘটনা তিনি সন্নিবেশিত করেছেন এবং সেগুলোর সন্নিবেশনের জন্য যে প্রকাশভঙ্গি তিনি অবলম্বন করেছেন তাদ্বারা সত্যিই পাঠক-হৃদয় বিগলিত হয়। আমি নিজেও কয়েকটি বই ক্রয় করে কয়েকজনকে হাদিয়া দিয়েছি এবং অসামান্য সুফল প্রত্যক্ষ করেছি। মূলত মনের যে অবস্থা থাকলে মানুষ ইসলামের বিধি-নিষেধকে চাপ মনে করার পরিবর্তে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাগত জানায় বন্ধুবর মাওলানা এই সিরিজের মাধ্যমে পাঠকদের মধ্যে সেই অবস্থা ও সহজাত প্রেরণাই সৃষ্টি করতে চেয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা সিরিজটিকে কবুল করুন এবং মাওলানাকে এর জন্য উপযুক্ত বিনিময় দান করুন। আমীন।

— (মাওলানা) সফিউল্লাহ ফুআদ

বিশিষ্ট লেখক ও কথাসাহিত্যিক, প্রখ্যাত আলেমে দীন
বহু গ্রন্থপ্রণেতা হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া
ইউসুফ নদভী দা. বা.-এর

মূল্যবান অভিমত

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম। তাঁর সঙ্গে কখনো আমার দেখা হয়নি। কিন্তু আমি তাঁর কর্ম দেখেছি। এই কর্মের ভিতরে তাঁকেও দেখেছি। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কেননা তিনি আমাকে একটি 'তাকরিয' লিখতে বলেছেন তাঁর– 'হৃদয় গলে সিরিজ'-এর জন্যে। কিন্তু কী তাকরিয লিখবো আমি? বাজার ছেয়ে-যাওয়া-পণ্যের জন্যে কিসের আবার বিজ্ঞাপন? তাঁর সিরিজ তো এখন 'সেই পণ্য'! কী বলবো আর তার শানে?

সিরিজ উচ্চারিত হলে আমরা সাধারণত ভাবি ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০। সর্বোচ্চ ১৫। কিন্তু কী আশ্চর্য! তাঁর সিরিজ এখন ৬০ ছাড়িয়ে যাচ্ছে!! এমন সিরিজের লেখককে ধন্যবাদ ও মুবারকবাদ না-জানালে ভীষণ অকৃতজ্ঞতা হবে। আপনাকে ধন্যবাদ! আপনাকে মুবারকবাদ!! আপনার কলম আরো গতিময় হোক! আরো সাবলীল ধারায় সাঁতার কাটুক! আঁধার মনের কঠিন পাথরে গিয়ে আঘাত করুক! তিমির-আচ্ছন্ন পাষাণ-হৃদয়গুলো গলে যাক– আপনার সিরিজের ছোঁয়ায়! আপনার কলমের 'খোঁচায়'! আপনার এ সিরিজের আগামীটা হোক আরো প্রাণবন্ত। আরো প্রাণস্পর্শী। আরো পাঠক-নন্দিত।

—(মাওলানা) ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

জামিউল কুরআন মাদরাসা, মিরপুর, ঢাকা-এর সম্মানিত মুহাদ্দিস, বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় লেখক, বিশিষ্ট কলামিস্ট বহু গ্রন্থপ্রণেতা হযরত মাওলানা যাইনুল আবেদীন সাহেব দা. বা.-এর মূল্যবান

বাণী ও দোয়া

পাঠক-পাঠিকারা যখন একজন লেখকের পঞ্চাশটিরও বেশি বই হাতে তুলে নেয়, তখন তিনি লেখক। তাছাড়া তখন আর তাঁর এবং তাঁর রচনা সম্পর্কে কিছু বলার থাকে না। অধিকন্তু পাঠকের যে উচ্ছ্বাস ও আবেগ প্রতিটি গ্রন্থের শেষে যুক্ত হয়েছে- তাতে লেখকের পাঠকপ্রিয়তা সহজেই অনুমান করা যায়। সেই সাথে আছে গ্রন্থের শুরুতে শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. থেকে শুরু করে প্রখ্যাত লেখক মাওলানা নোমান আহমদ সাহেব পর্যন্ত অনেক বড় বড় মানুষের বাণী, মূল্যায়ন ও অভিমত।

আমি মুগ্ধ হয়েছি লেখকের সাধনার নিরবচ্ছিন্নতায়। এ দেশের সরলপ্রাণ পাঠকসমাজকে স্পর্শ করার ভাব ও ভাষা লেখক অধিকার করতে পেরেছেন- এটা তাঁর বৈশিষ্ট্য! আগামী দিনে লেখকের সৃষ্টি ও সাফল্য আরো গতি পাক- এই কামনা করছি।

দোয়ার মুহতাজ

(মাওলানা) মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন

বিশিষ্ট লেখক ও আলেমে দীন, বহু গ্রন্থপ্রণেতা, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ মাদরাসার স্বনামধন্য মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা নাসীম আরাফাত সাহেব দা. বা.-এর মূল্যবান

বাণী ও দোয়া

'হৃদয় গলে সিরিজ' নিয়ে বলার ও লেখার অনেক কিছু আছে। তার ভাষার সাবলীলতা, পাঠক-মুগ্ধতা, শব্দের ব্যাঞ্জনা, ঘটনাবলীর নির্বাচন সব কিছুই হৃদয়কে বিগলিত করে। বাংলা ভাষায় ইসলামী প্রকাশনা জগতে সিরিজ বই হতে পারে তা কেউ কখনো চিন্তাও করেনি। অবশেষে তা হলো। আরো বিস্ময়কর ব্যাপার, হৃদয় গলে সিরিজ এখন শ'-এর কোঠা ছুঁইছুঁই করছে। আর পাঠকমহলে তার অসীম গ্রহণযোগ্যতা, ব্যাপক আলোড়ন আর আলোচনা-সমালোচনা এক ঈর্ষণীয় ব্যাপার! দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম সাহেবের মেহনতকে কবুল করুন। তাঁর চলার পথকে কুসুমাস্তৃর্ণ করুন। আর যুগ যুগ ধরে তাঁর গ্রন্থগুলোকে বাংলার আম-জনতার জন্য হিদায়াতের জ্যোতির্ময় মিনারা রূপে কবুল করুন। আমীন।

— (মাওলানা) নাসীম আরাফাত
জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ
ঢাকা, ১২১৯

সূচির পাতা

জানাযার নামাজে সূরা ফাতেহা পড়া কিরূপ?... ১১

কোন্ বৈশিষ্ট্য দেখে আমরা জান্নাতি দল চিনতে পারব?... ১৮

গণতন্ত্র কী?... ২০

গণতন্ত্র ও ইসলামী খেলাফতের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কী?... ২০

গণতন্ত্র ও ইসলামী খেলাফতে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের পদ্ধতি কী?... ২১

গণতন্ত্রের মাধ্যমে কি ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব?... ২২

ইসলামে শুরা কাকে বলে?... ২২

জীবন মানে কী?... ২২

সত্যিই কি সুদের পরিণাম মারাত্মক?... ২৪

সুদের সর্বগ্রাসী সয়লাব থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় আছে কি?... ৩৯

জান্নাত কীভাবে পাওয়া যাবে?... ৪৯

লজ্জাশীলতা কী?... ৫৮

পাক হিন্দে ইসলাম কারা এনেছে?... ৫৯

আলেমদের মাওলানা বলা কি জায়েয?... ৬৫

মক্কা মদীনা কেন কটুক্তির কবলে?... ৬৫

নবীজী কি হযরত খাদিজা রাযি.-কে সম্পদের লোভে বিবাহ করেছিলেন?... ৬৫

ইবাদতে ইস্তিকামাত বা দৃঢ়চিত্ততা কীভাবে অর্জন হবে?... ৭০

প্রিয়নবীর ব্যাপারে আমাদের আক্বীদা-বিশ্বাস কেমন হবে?... ৭১

প্রচলিত মিলাদ, কিয়ামের পদ্ধতি জায়েয কি না?... ৭২

মাল্টিলেভেল মার্কেটিং পদ্ধতির কোনো কোম্পানীতে জড়িত হওয়া যাবে কি ?... ৭৪

ইহ ও পরকালে আল্লাহ তাআলাকে দেখা যাবে কি?... ৭৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবী– দলীল কি?... ৭৫

দাড়ি রাখা কি ওয়াজিব? ওয়াজিব হলে কতটুকু পরিমাণ ওয়াজিব?... ৭৬

আল্লাহ্ যা করেন আমাদের মঙ্গলের জন্য করেন– দলীল কী?... ৭৯

যেসব অমুসলমান ইসলামের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায় না, অথচ তারা পৃথিবীতে অনেক ভালো কাজ করেন, তাদের ব্যাপারে ইসলাম কী বলে?... ৮০

যেসব খ্রিস্টান এক আল্লাহ্ ও ঈসা আ.-এর ওপর বিশ্বাস রাখেন, তাদের কী হবে?... ৮০

যাদের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছেনি, তাদের কী বিধান?... ৮০

নাস্তিকতার ভয়ঙ্কর ছোবলে যুবসমাজ : করণীয় কী?... ৮৩

নবীজী কেন হযরত যায়েদ রাযি.-এর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করলেন?... ৯২

সূর্য কি পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে?... ৯৯

ডাক্তারগণ মাতৃগর্ভে কী আছে– বলে দিতে পারেন। অথচ পবিত্র কুরআনের এক আয়াতে আছে, মাতৃগর্ভে কী আছে তা আল্লাহ্ তাআলাই জানেন– এর সমাধান কি?... ১০২

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তলোয়ারের মাধ্যমে– বাস্তবতা কতটুকু?... ১০৩

শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোনো অবিবাহিতা যুবতী নারী মাহরাম ছাড়া নিজ এলাকা থেকে দূরে কোথাও গিয়ে পড়ালেখা করতে পারবে কি?... ১০৫

ছবি আঁকা ও ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি?... ১০৬

ছাত্র-ছাত্রীদের একত্রে পড়ানো যাবে কি?... ১০৭

বৃক্ষরোপণ কি ইবাদত?... ১০৮

পাঠকের মতামত... ১১১

দৃষ্টি আকর্ষণ... ১১২

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রশ্ন : জানাযার নামাজে সূরা ফাতেহা পড়া কিরূপ? হাদীস শরীফে এই সূরা পড়ার কথা আছে কি?

উত্তর : বর্তমানে কোনো কোনো আলেম জানাযার নামাজে সূরা ফাতেহা পড়ার কথা বলেন। কেউ কেউ তো এ-ও বলেন যে, সূরা ফাতেহা ব্যতীত জানাযার নামাজ হয় না। সূরা ফাতেহা ছাড়া এ পর্যন্ত যেসব নামাজ পড়া হয়েছে সেগুলো হয়নি!

তাছাড়া ইদানীং "জানাযার সালাতে সূরা ফাতেহা পড়া যাবে কি?" নামক একটি ছোট পুস্তিকা প্রকাশ পাওয়াতে এ বিষয়ে জনমনে আরও কৌতুহল সৃষ্টি হয়েছে। এতে লেখক উল্লেখ করেছেন যে, জানাযার নামাজে সূরা ফাতেহা পড়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল ও নির্দেশ রয়েছে। আর যে সংস্থা পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছে তারা মানুষের কাছে বলে বেড়ায় যে, তারা সহীহ্ হাদীস ছাড়া আমল করেন না। শুধু তাই নয়, তারা সহীহ্ হাদীস অনুযায়ী আমল করতে অন্যকে আহ্বানও করে থাকেন।

যদি সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ আমল ও নির্দেশ পাওয়া যায় তাহলে তো এ আমলটি আমলের জন্য নির্ধারিত হওয়া অপরিহার্য। অর্থাৎ জানাযার নামাজে সূরা ফাতেহা পড়া জরুরি। তাই তাদের উক্ত পুস্তিকাতে উল্লেখিত হাদীসগুলো পর্যালোচনা করে দেখা দরকার। এ সম্পর্কে আমাদের কাছে সাতটি হাদীস পৌঁছেছে। প্রথমে এই হাদীসগুলো সনদসহ নিম্নে উল্লেখ করছি।

প্রথম হাদীস :

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي ثنا أبو إبراهيم بن أبي يحيي ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال : كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يكبّر علي جنائزنا أربعاً ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولي.

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি.বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জানাযার নামাজে চার তাকবীর বলতেন এবং প্রথম তাকবীরে সূরা ফাতেহা পাঠ করতেন"। [মুসতাদরাকে হাকীম : ১ম খণ্ড : ৫১০ পৃষ্ঠা]

এ হাদীসের সনদে 'আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আকীল ইবনে আবু তালিব' কুরাইশী বর্ণনাকারী। তার কুনিয়াত [উপনাম] হচ্ছে আবু মুহাম্মদ। তার সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণ বলেন–

১. ইবনে সাদ তার সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি منكر الحديث অর্থাৎ তার হাদীসকে আলেমগণ দলীল হিসাবে গ্রহণ করেন না।
২. বিশর ইবনে উমর রহ.বলেন– ইমাম মালেক রহ. তার থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন না।
৩. ইমাম বুখারী রহ.-এর উস্তাদ আলী ইবনে মাদিনী রহ. বলেন– ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ রহ. তার থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন না।
৪. ইয়াকুব ইবনে শায়বা রহ. আলী ইবনে মাদিনী রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, ইমাম মালেক রহ. তাকে স্বীয় কিতাবগুলোতে স্থান দিতেন না।

৫. ইয়াকুব রহ. এবং ইবনে আকীল রহ. বলেন, তিনি সত্যবাদী। তবে তার হাদীসে চরম পর্যায়ের দুর্বলতা রয়েছে।

৬. ইবনে উয়াইনা রহ. বলতেন, কুরাইশী চার ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস বর্জন করা হয়। অতঃপর এ চার ব্যক্তির মধ্যে তার নাম উল্লেখ করেন।

৭. ইমাম বুখারী রহ.-এর উস্তাদ আল্লামা হুমাইদী রহ. বলেন, তার মুখস্থের মধ্যে দোষ ছিল।

৮. ইমাম আহমদ রহ. তাকে 'মুনকারুল হাদীস' বলেছেন।

৯. ইবনে মঈন ইবনে আকীল রহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, তার হাদীস দলিল হিসাবে গণ্য নয়।

১০. মুআবিয়া ইবনে সালেহ্ রহ. ইবনে মাঈন থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ছিলেন হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল।

১১. ইমাম আবু হাতেম রহ.বলেন, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দুর্বল। সবল নন। যাদের হাদীস দলিল হিসাবে গণ্য হয় না তিনি তাদের একজন।

১২. ইমাম নাসায়ী রহ.তাকে দুর্বল বলেছেন।

১৩. ইবনে খুযাইমা রহ.বলেন, তার মুখস্থ ক্ষমতায় দোষ থাকার কারণে আমি তার হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করি না। [দেখুন : তাহযীবুত তাহযীব : ১৩ খণ্ড, ২১ পৃষ্ঠা]

এত সংখ্যক হাদীস বিশারদ এ হাদীসের বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আকীল সম্পর্কে উপরোক্ত অভিমত প্রকাশ করায় হাদীসটি নিঃসন্দেহে দুর্বল বলে প্রমাণিত।

<u>দ্বিতীয় হাদীস :</u>

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا زيد بن الحباب حدثنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رض أن النبي صلي الله عليه وسلم قرأ علي الجنازة بفاتحة الكتاب.

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাজার নামাজে সূরা ফাতেহা পাঠ করেছেন। [ইবনে মাযাহ, ১ম খণ্ড, ৪৭৯ পৃষ্ঠা]

হাদীসের সনদে ইবরাহীম ইবনে উসমান ওয়াসেতী একজন বর্ণনাকারী। তার সম্পর্কে হাদীস বিশারদদের অভিমত–

১. তাহযীবুত তাহযীব নামক গ্রন্থে তাকে متروك الحديث তথা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে পরিত্যাজ্য বলা হয়েছে। [১ম খণ্ড, ৯২ পৃষ্ঠা]

২. ইমাম শু'বা তাকে كذّاب অর্থাৎ চরম মিথ্যুক বলেছেন। [মিয়ানুল ই'তিদাল : ১/৪৭]

তাহযীবুল কামাল নামক গ্রন্থে ২য় খণ্ড ১৪৭-১৪৮ পৃষ্ঠায় বিভিন্ন হাদীস বিশারদদের অভিমত এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে–

৩. আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.কে আবু শায়বা ইবরাহীম ইবনে উসমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি তাকে যয়ীফ বা দুর্বল বর্ণনাকারী বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

৪. ইমাম মুআবিয়া ইবনে সালেহ রহ. ইয়াহইয়া ইবনে মঈন রহ.-এর অভিমত উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাকে যয়ীফ বলেছেন।

৫. ইমাম আবু দাউদ রহ.তাকে যয়ীফ বলেছেন।

৬. ইমাম তিরমিযী রহ. তাকে منكر الحديث বলেছেন।

৭. ইমাম নাসায়ী এবং আবু বিশর দাওলায়ী রহ. তাকেمتروك الحديث তথা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে পরিত্যাজ্য বলেছেন।

৮. ইমাম আবু হাতিম রহ. তাকে ضعيف الحديث বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, আলেমগণ তার বর্ণিত হাদীস বর্জন করেছেন।

৯. ইবরাহীম ইবনে ইয়াকুব জাওজানী রহ.তাকে ساقط [অগ্রহণযোগ্য] বলেছেন। [১০] ইসহাক ইবনে মানসুর এবং উসমান ইবনে সাঈদ আদ্দারামী রহ.ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাকে ليس بثقة [তিনি নির্ভরযোগ্য নহেন] বলেছেন।

এ হাদীসের সনদের অবস্থাও দেখুন। জগৎবিখ্যাত হাদীস বিশারদগণ এ হাদীসের বর্ণনাকারী ইবরাহীম ইবনে উসমান সম্পর্কে কী অভিমত প্রকাশ করেছেন! সুতরাং হাদীসটি নিঃসন্দেহে যয়ীফ তথা দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য।

তৃতীয় হাদীস

حدثنا عمرو بن أبي عاصم النبيل وإبراهيم بن المستمر قالا : حدثنا أبو عاصم حدثنا حماد بن جعفر العبدي حدثني شهر بن حوشب حدثتني أم شريك الأنصارية قالت : أمرَنا رسول الله صلي الله عليه وسلم أن نقرأ علي الجنازة بفاتحة الكتاب.

"হযরত উম্মে শরীক আনসারী রাযি. বলেন– জানাযার নামাজে সূরা ফাতেহা পড়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।" [ইবনে মাজাহ : ১ম খণ্ড, ৪৮৯ পৃষ্ঠা]

এ হাদীসে শাহ্র ইবনে হাওশাব নামক বর্ণনাকারী রয়েছেন। তার সম্পর্কে الزوائد নামক কিতাবে আছে–

১. বিখ্যাত হাদীস বিশারদ ইবনে আওফ রহ. তাকে পরিত্যাগ করেছেন।
২. ইমাম বায়হাকী রহ. তাকে দুর্বল বলেছেন।
৩. ইমাম নাসায়ী, ইমাম হাম্মাদ প্রমুখ রহ. তাকে لَيِّنٌ তথা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে নরম বলেন।
৪. লা মাজহাবীদের ইমাম শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানী হাদীসটি যয়ীফ বলে মত প্রকাশ করেছেন।

বিভিন্ন হাদীস বিশারদদের অভিমত বিশেষ করে শায়খ আলবানীর অভিমত সুস্পষ্ট বলে দিচ্ছে যে, হাদীসটি দুর্বল।

৪র্থ হাদীস :

حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي ح وحدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا عاصم بن علي قالا : حدثنا عبد المنعم أبو سعيد الحراني

الإسوري عن الصلت بن دينار عن أبي عثمان النهدي عن امرأة يقال لها أم عفيف قالتْ : بايعنا رسول الله صلي الله عليه وسلم حين بايعَ النساءَ فأخذ عليهنَّ أن لا تحدثنَ الرجلَ إلا محرما وأمرنا أن نقرأ علي ميِّتنا بفاتحة الكتاب.

এ হাদীসে উল্লেখ আছে যে, উম্মে আফিফ রাযি. বলেছেন যে, জানাজার নামাজে সূরা ফাতেহা পড়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আদেশ করেছেন।" [আল মু'জামুল কবীর : ১৮ খণ্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা]

এ হাদীসে আব্দুল মুনঈম ইসওয়ারী নামক বর্ণনাকারী রয়েছেন। তার সম্পর্কে হাদীস বিশারদদের অভিমত হচ্ছে–

১. ইমাম বুখারী রহ. ও ইমাম আবু হাতেম রহ. বলেন যে, তিনি হচ্ছেন منكر الحديث

২. ইমাম নাসায়ী রহ. বলেছেন, ليس بثقة [তিনি নির্ভরযোগ্য নন]

৩. হাকিম রহ.বলেন,ليس بالقوي [তিনি সবল নন]

৪. ইমাম মিজ্জি রহ.বলেন, ضعيف الحديث [হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল]

৫. ইমাম দারা কুতনী রহ.বলেন, متروك অর্থাৎ তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত।

অতঃপর তার উস্তাদ সলত্ ইবনে দীনার রহ.রয়েছেন। তার সম্পর্কে হাদীস বিশারদদের অভিমত হচ্ছে–

১. ইমাম আহমদ রহ.বলেছেন যে, সলত্ ইবনে দীনার متروك الحديث অর্থাৎ মানুষ তার বর্ণিত হাদীস বর্জন করেছে।

২. ইমাম বুখারী রহ.-এর উস্তাদ ইবনে মঈন রহ.বলেছেন- ليس بشيء অর্থাৎ তিনি কিছু নন। অর্থাৎ তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার মত নয়।

৩. আমর ইবনে আলী রহ. বলেন, كثير الغلط অধিক ভুল করেন এবং متروك الحديث তার হাদীস বর্জন করা হয়।

৪. ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ এবং আ. রহমান রহ. তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন না।

৫. ইমাম বুখারী রহ. বলেন যে, ইমাম শু'বা রহ. তার সমালোচনা করেছেন।

৬. ইমাম আবু দাউদ রহ.তাকে যয়ীফ বলেছেন ।

৭. ইমাম তিরমিযি রহ. বলেন যে, কোনো কোনো আহলে ইলম তার সমালোচনা করেছেন ।

৮. ইমাম নাসায়ী রহ.বলেন– ليس بثقة অর্থাৎ তিনি নির্ভরযোগ্য নন ।

৯. ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান রহ. বলে– ضعيف ليس بشيءٍ.

১০. ইমাম বুখারী রহ. তারীখ নামক গ্রন্থে তার বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, তার বর্ণিত হাদীস দলিল হতে পারে না ।

১১. ইবনে সা'দ রহ.ও তাকে ضعيف ليس بشيءٍ. বলেছেন ।

১২. আবু আহমদ হাকীম রহ. বলেছেন যে, তিনি হচ্ছেন– متروك الحديث

১৩. ইমাম আহমদ রহ.এর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ বলেছেন, তার বর্ণিত হাদীস লিপিবদ্ধ করতে আমার পিতা আমাকে নিষেধ করেছেন । [তাহযীবুত তাহযীব : ১৬ খণ্ড, ৫৬ পৃষ্ঠা # মিযানুল ই'তিদাল : ২য় খণ্ড, ৩১৭ পৃষ্ঠা]

প্রিয় পাঠক! এ পর্যন্ত চারটি হাদীস উল্লেখ করে এদের বর্ণনাকারীদের অবস্থাও তুলে ধরা হল । এতে কারো হয়তো বুঝতে বাকি নেই যে, হাদীস চতুষ্টয় কত দুর্বল! এসব হাদীস, জগতের বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য হাদীস বিশারদদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় । আপনারা উপরিউক্ত আলোচনায় এটাও দেখতে পেয়েছেন যে, তারা কীভাবে এগুলো প্রত্যাখ্যান করেছেন! অথচ “জানাযার সালাতে সূরা ফাতেহা পড়া যাবে কি?” নামক পুস্তকে এ হাদীসগুলো উল্লেখ করে দাবি করা হয়েছে যে, জানাযার নামাজে সূরা ফাতেহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে পড়েছেন এবং অন্যদেরকে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন । অধিকন্তু তারা সর্বদা বলে বেড়াচ্ছে যে, তাদের আমল ও অভিমত সহীহ হাদীস মোতাবেক হয়ে থাকে । আপনারাও হয়তো ঐ পুস্তিকাটি পেয়ে এগুলোকে সহীহ হাদীস বলে বিশ্বাস করেছেন । এবার চিন্তা করে দেখুন, এখানে কী কূট-কৌশলের অবতারণা করা হয়েছে! আল্লাহ তাআলা সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন । আমীন ।

প্রশ্ন: আমরা জানি, আমাদের ধর্মে ৭৩টি দল হবে। তার মধ্যে কেবল একটি দলই জান্নাতি হবে। বাকি দলগুলো হবে জাহান্নামী। প্রশ্ন হলো, কোন্ বৈশিষ্ট্য দেখে আমরা জান্নাতি দলটি চিনে নিতে পারব?

জবাব : হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মত তা'ই করবে যা করেছে বনী ইসরাঈলের লোকেরা। এক জুতা অপর জুতার সমান হওয়ার মত। এমনকি যদি ওদের মধ্যে কেউ মায়ের সাথে প্রকাশ্যে জিনা করে থাকে, তাহলে এই উম্মতের মধ্যেও এরকম ব্যক্তি হবে যে একাজটি করবে। আর নিশ্চয় বনী ইসরাঈল ছিল ৭২ দলে বিভক্ত। আর আমার উম্মত হবে ৭৩ দলে বিভক্ত। এই সব দলই হবে জাহান্নামী একটি দল ছাড়া। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন-সেই দলটি কারা? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– যারা আমার ও আমার সাহাবাদের মত ও পথ অনুসরণ করবে। [সুনানে তিরমিযি, হাদীস নং : ২৬৪১ # আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস নং : ৭৬৫৯ # আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস নং : ৪৮৮৯ # কানযুল উম্মাল ফি সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফআল, হাদীস নং : ১০৬০]

বনী ইসরাঈলের মধ্যে ছিল ৭২ ফিরক্বা। এর মধ্যে ১টি ফিরক্বা ছিল জান্নাতী। আর ৭১ টি ফিরক্বা ছিল জাহান্নামী।

আর এই উম্মতের মধ্যে হবে ৭৩টি ফিরক্বা। এর মধ্যে ১টি ফিরক্বা হবে জান্নাতী আর ৭২টি ফিরক্বা হলো জাহান্নামী।

নবী করীম কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, পূর্বের উম্মত যাই করেছে এই উম্মতও তাই করবে নাফরমানীর দিক থেকে। তথা ওরা যত পদ্ধতিতে নাফরমানী করেছে এই উম্মতও সেই পদ্ধতিতে নাফরমানী করবে। সুতরাং আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করার ৭১টি পদ্ধতিওয়ালা বাতিল ফিরক্বা পূর্ব উম্মত থেকে গ্রহণ করবে এই উম্মত। তথা ৭১টি বাতিল ফিরক্বার মত ও পথ পূর্ব উম্মতের মত এই উম্মতেও থাকবে।

আর জান্নাতী ছিল পূর্ব উম্মতের ৭২ ফিরক্বার মধ্যে একটি ফিরক্বা। সেটিও এ উম্মতের মধ্যে পূর্ব পদ্ধতি অনুযায়ী থাকবে। শুধু বাড়বে একটি বাতিল ফিরক্বা। যেই বাতিল ফিরক্বার কোনো নজীর পূর্ব উম্মতের মধ্যে

ছিল না। সেই বর্ধিত বাতিল ফিরক্বাটি কারা? আল্লামা কুরতুবী রহ. তাঁর প্রণীত তাফসীরে কুরতুবীতে লিখেন–

যেই ফিরক্বাটি উম্মতে মুহাম্মদীতে বাড়বে তারা হলো– ওলামাদের সাথে শত্রুতা করবে, আর ফুক্বাহাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখবে। এই গ্রুপটি পূর্বের উম্মতের মধ্যে ছিল না। [তাফসীরে কুরতুবী]

এই উম্মতের মধ্যে বর্ধিত বাতিল ফিরক্বাটি হলো ফিক্বহ ও ফুক্বাহাদের দুশমন, তথা ইজতিহাদ ও মুজতাহিদদের দুশমন দল। কারণ পূর্ব উম্মতের মধ্যে কেবল নবীর আনীত দীনের ওপর আমল করতে হত, নতুন করে নীতিমালার আলোকে কোনো উদ্ভাবন করার কোনো সুযোগ ছিল না। যেহেতু ইজতিহাদই ছিল না, তাই ইজতিহাদ ও মুজতাহিদ তথা ফিক্বহ ও ফক্বীহ অস্বীকারকারী কোনো বাতিল ফিরক্বাও ছিল না। আর এই উম্মতে যেহেতু ফিক্বহ ও ফক্বীহ আছে, তথা ইজতিহাদ ও মুজতাহিদ আছে, তাই এর দুশমনও আছে। এই উম্মতের বর্ধিত সেই বাতিল ফিরক্বাটি হলো ফিক্বহ ও ফক্বীহদের সমালোচনাকারী, ইজতিহাদ ও মুজতাহিদীনদের দুশমন দল। ফিক্বহে হানাফী, ফিক্বহে শাফেয়ী, ফিক্বহে মালেকী, ফিক্বহে হাম্বলী অস্বীকারকারী দল হলো এই উম্মতের বর্ধিত বাতিল ফিরক্বা।

মুরজিয়া, কাদরিয়া, জাবরিয়া, শিয়া, কাদিয়ানী, বেদআতি ইত্যাদি বাতিল ফিরক্বা এই উম্মতের বর্ধিত বাতিল ফিরক্বা নয়। পূর্ব থেকেই এই সব দলের নজীর আছে। কিন্তু ফক্বীহদের দুশমন বাতিল ফিরক্বার নজীর পূর্ব থেকে নেই। যেহেতু পূর্বে ফিক্বহ ও ফক্বীহই ছিল না।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! ফিক্বহ ও ফক্বীহদের সমালোচনাকারী, ইজতিহাদ ও মুজতাহিদীনদের দুশমন কারা, তা বোধ হয় আমার আর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে [আহলে হাদীস নামধারী লা মাযহাবীদেরকে] হেদায়েত দান করুন। আমীন।

নাজাতপ্রাপ্ত দল

নাজাতপ্রাপ্ত দল কারা? হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্টতই সেই নাজাতপ্রাপ্ত দলের পরিচয় দিয়ে দিয়েছেন। নাজাতপ্রাপ্ত হলো সেই দল যারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাত ও

সাহাবায়ে কিরামের জামাতের মত ও পথের অনুসারী। এক কথায় যারা সুন্নাতধারী, সেইসাথে সাহাবাদের মত ও পথের অনুসারী; যাকে আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলে থাকি।

নাজাতপ্রাপ্ত দল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত কোনো রেজিষ্ট্রিকৃত দলের নাম নয়, এটি একটি আদর্শের নাম। যারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাত আঁকড়ে থাকবে, সেইসাথে সাহাবাদের মত ও পথের অনুসারী হবে তারাই হবে জান্নাতী দল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত।

প্রশ্ন : গণতন্ত্র কী?

উত্তর : গণতন্ত্র শব্দটি গ্রীক শব্দ ডেমোক্রেসি এর অনুবাদ। পরিভাষায় গণতন্ত্র বলা হয়– জনসাধারণের প্রতিনিধি দ্বারা সাম্যের নীতি অনুসারে রাষ্ট্রশাসন করা। গণতান্ত্রিক সরকার বলা হয় কোনো শ্রেণী, গোষ্ঠী বা ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক শাসনের পরিবর্তে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের নিয়ন্ত্রণাধীন পরিচালিত সরকারকে।

প্রশ্ন : গণতন্ত্র ও ইসলামী খেলাফতের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কী?

উত্তর : গণতন্ত্র ও ইসলামী খেলাফতের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যগুলো হলো–

গণতন্ত্র পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালনা মানে হলো, মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনা করা। আর খেলাফতের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা মানে হলো আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনা করা।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা মানে মানুষের সৃষ্ট মতবাদ প্রতিষ্ঠা। আর খেলাফত প্রতিষ্ঠা মানে আল্লাহর নির্ধারিত বিধান প্রতিষ্ঠা।

গণতন্ত্রের মূল থিউরী হলো যেভাবেই হোক মানুষকে সন্তুষ্ট করা। আর ইসলামী খিলাফতের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তারই নির্ধারিত বিধান অনুপাতে জনসেবা করা।

প্রশ্ন : গণতন্ত্র ও ইসলামী খেলাফতে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের পদ্ধতি কী?

উত্তর : প্রচলিত গণতন্ত্রে রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচনের পদ্ধতি মাত্র একটাই। সেটা হলো সাধারণ নির্বাচন। পক্ষান্তরে ইসলামী খেলাফত পদ্ধতিতে রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচনের পদ্ধতি বহুবিধ।

প্রচলিত গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের ছোট-বড়, যোগ্য-অযোগ্য, বুদ্ধিমান-নির্বোধ নির্বিশেষে সকলের রায় বা মতামত [ভোট] সমানভাবে মূল্যায়িত হয়ে থাকে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, খুলাফায়ে রাশেদীন এবং আদর্শ যুগের কর্মপন্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইসলাম মতামত গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যথাযথ কর্তৃত্ব সম্পন্ন যোগ্য কর্তৃপক্ষের মতামতের মূল্যায়ন করে থাকে। কেননা ঢালাওভাবে সকলের মত গ্রহণ ও সকলের মতামতের সমান মূল্যায়ন দ্বারা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার বিষয়টি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কুরআনের একটি আয়াতে এদিকে ইংগিত করা হয়েছে–

যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথামত চল, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে। [সূরা আনআম, আয়াত : ১১৬]

প্রচলিত গণতন্ত্রে জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস মানা হয়। অথচ জনগণকে ক্ষমতার উৎস মানা ঈমান পরিপন্থী। কেননা, ইসলামী আকীদা বিশ্বাসে আল্লাহকেই সর্বময় ক্ষমতার উৎস স্বীকার করা হয়। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

* বলো সমস্ত কিছুর কর্তৃত্ব [সর্বময় ক্ষমতা] কার হাতে? [সূরা মুমিনুন, আয়াত : ৮৮]

* বলো, হে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও। যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর। যাকে ইচ্ছে পদদলিত কর। সব কিছুই তোমার হাতে। নিশ্চয় তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। [সূরা ইমরান, আয়াত : ২৬]

* কর্তৃত্ব তো আল্লাহরই। [সূরা আনআম, আয়াত : ৫৭]

প্রশ্ন : গণতন্ত্রের মাধ্যমে কি ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব?

উত্তর : না, আল্লাহর দেওয়া নির্ধারিত পথ– খিলাফত প্রতিষ্ঠা ছাড়া মানুষের গড়া মতবাদ– গণতন্ত্র দিয়ে কখনোই ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতে পারে না। তবে কিছুটা কল্যাণধর্মী কাজ করা যেতে পারে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন : ইসলামে শুরা কাকে বলে?

উত্তর : কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সমাধানের জন্য উক্ত বিষয়ে বিজ্ঞ ও পরহেযগার ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে বলা হয় শুরা পদ্ধতি। আর গণতন্ত্র হলো জ্ঞানী-মুর্খ, বোকা-বুদ্ধিমান সকল প্রকার মানুষের মতকে গ্রহণ করে আধিক্যের ওপর ফায়সালা করা। চাই বোকার দল বেশি হওয়ার কারণে সিদ্ধান্তটি ভুল হোক বা সঠিক হোক।

একটি জরুরি জ্ঞাতব্য

বর্তমান বাংলাদেশে যেহেতু গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ছাড়া ক্ষমতা গ্রহণ অসম্ভব। তাই মন্দের সয়লাব রুখতে প্রয়োজনে গণতন্ত্রের মাধ্যমে নির্বাচন করা জায়েয আছে "তীব্র প্রয়োজন হারামকে হালাল করে দেয়" মূলনীতির ভিত্তিতে। কিন্তু মূল প্রেরণা থাকবে খেলাফত প্রতিষ্ঠা। কিন্তু পরিবেশের কারণে একদম ধর্মদ্রোহীদের হাতে ক্ষমতা চলে যাওয়ার আশংকা থাকার দরুণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন করা বর্তমানে জায়েয। তবে অযোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দেওয়া সম্পূর্ণ হারাম। [তথ্যসূত্র : জাওয়াহিরুল ফিক্বহ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৯১-২৯৫ # ইসলামী আক্বিদা ও ভ্রান্ত মতবাদ, পৃষ্ঠা : ৬১৯-৬২৬]

প্রশ্ন : জীবন মানে কী?

উত্তর : জীবনকে আমরা অনেকে অনেকভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকি। বিভিন্ন পেশাগত দিক দিয়ে মানুষ তার জীবনের অর্থ বুঝিয়ে থাকে। কেউ যদি চাকুরি করে তাহলে সে ভাবে, জীবন মানে চাকুরি করা, আর চাকুরি মানেই জীবন। এটা ছাড়া সে অন্য কিছু ভাবতে পারে না। অন্যদিকে যে

ব্যবসা করে সে মনে করে, ব্যবসা মানেই জীবন, আর জীবন মানেই ব্যবসা। তার দৃষ্টিভঙ্গি অন্যদিকে ফেরার মত নয়।

ঠিক তেমনি যারা কৃষিকাজ করে তারা মনে করে জীবন মানেই কৃষিকাজ, আর কৃষিকাজ মানেই জীবন। সারকথা আপনি দেখবেন প্রত্যেকেই যার যার অবস্থান থেকে নিজের পেশাগত অবস্থাটাকেই জীবন ভাবে। অন্যকিছু ভাবাটা তার জীবনে অন্যায়বোধ মনে হয়। এর বিপরীত কেউ কিছু বোঝালে সে বুঝতে চায় না। ছোটকাল থেকে কৃষি ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে জীবন অতিবাহিত করায় জীবন মানে যে অন্যটা সে তা বুঝতে চেষ্টা করে না। যে তাকে বুঝাতে চায় সে উল্টা তাকে বোকা বলে ফিরিয়ে দেয়।

তাহলে এর সারমর্ম দাঁড়াল যে, পৃথিবীতে আসার পর যে কোনো একটা পেশা গ্রহণ করতঃ জীবন নির্বাহ করার মানেই জীবন।

আমি বলব, না। আমি এ কথার সাথে ঐকমত্য পোষণ করতে পারলাম না। কারণ, জীবন মানে উপরোল্লিখিত বিষয়াদি নয়। বরং জীবন মানে মহান আল্লাহর দাসত্ব করা। এছাড়া জীবনের আর কোনো দ্বিতীয় লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা সূরায়ে যারিয়াতের ৫৬ নং আয়াতে বলেন যে, আমি মানব এবং জ্বিন জাতিকে একমাত্র আমার দাসত্বের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাহলে উক্ত আয়াত থেকে বোঝা গেল, জীবনের একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো, এক আল্লাহর দাসত্ব করা। সুতরাং জীবন মানে দাসত্ব, আর দাসত্ব মানে জীবন। আর এ দাসত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্যে হতে হবে। আর হ্যাঁ; এটা শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য। বিধর্মীদের বেলায় নয়। আর উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো মূলত জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নয়, বরং এগুলো জীবনের সাথে সম্পৃক্ত বিষয় মাত্র।

এটা কীভাবে? একটা ঘটনা দ্বারা তা বুঝে আসবে বলেই আশা করি। একদা আল্লাহর এক প্রিয়বান্দা লোকদেরকে বললেন, আমি জীবনে কোনোদিন পানাহার করিনি। উপস্থিত শ্রোতাদের একজন বলল, হযরত! এটা কীভাবে সম্ভব? তিনি উত্তর দিলেন, আমার যখন ক্ষুধা লাগে তখন আমি পানাহার করি। অন্যথায় নয়। আমার মনের চাহিদা মেটানোর জন্য আমি কোনোদিন কিছু খাইনি। যখন প্রচণ্ড ক্ষুধা অনুভব করি তখনই খাই।

আর তা করি একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার দাসত্ব পালনের জন্য, তার নির্দেশ পালনের জন্য। কারণ, দৈহিক শক্তি ছাড়া মানুষ আল্লাহর দাসত্ব করতে পারে না। তাই আমি পরিমাণমত পানাহার করে থাকি।

উক্ত ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য শুধু মনের চাহিদা বা স্বীয় পেশাগত কর্ম নয়। বরং জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর দাসত্ব করা, তার গোলামী করা। মোটকথা, জীবন মানে আল্লাহর দাসত্ব, আর আল্লাহর দাসত্ব মানেই জীবন। তাই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে, তাহলে জীবন পাল্টে যাবে।

প্রশ্ন : সত্যিই কি সুদের পরিণাম মারাত্মক?

উত্তর : হ্যাঁ, সুদের পরিণাম অত্যন্ত মারাত্মক। ইসলামের দৃষ্টিতে তা একটি মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক শোষণের কৌশল। এর জন্য যে শুধু আখেরাতেই কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে তা নয়, বরং দুনিয়াতেও সুদ, সুদদাতা, সুদগ্রহীতা এবং দেশের জনগণের জন্য বয়ে আনে নানান বিপদ। সুদের মাধ্যমে টাকা উপার্জন ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে একটি অমার্জনীয় অপরাধ। আরবীতে একে বলা হয় রিবা, ইংরেজীতে বলে– Interest।

সুদ প্রসঙ্গে ইসলামের অবস্থান সবচেয়ে কঠোর ও অনমনীয়। সূরা বাকারায় মহান আল্লাহ্ বলেন– 'হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা [সুদের ব্যাপারে] আল্লাহকে ভয় করো, আগের [সুদী কারবারের] যে সব বকেয়া আছে তোমরা তা ছেড়ে দাও; যদি সত্যিই তোমরা আল্লাহর ওপর ঈমান আনো। যদি তোমরা এমনটি না করো, তাহলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে [তোমাদের বিরুদ্ধে] যুদ্ধের [ঘোষণা থাকবে]। [সূরা বাকারা, আয়াত : ২৭৮-২৭৯]

কিয়ামতের দিন সুদখোরদের অবস্থা কেমন হবে সে সম্পর্কে ঐ সূরাতেই বলা হয়েছে–

'যারা সুদ খায় তারা কিয়ামতে দণ্ডায়মান হবে যেভাবে দণ্ডায়মান হবে ঐ ব্যক্তি যার ওপর শয়তান আছর করে। এটা এ কারণে, যেহেতু এরা

বলে, ব্যবসা তো সুদের মতোই [একটা কারবারের নাম]'। [সূরা বাকারা, আয়াত : ২৭৫]

সুদের লেনদেন ও সুদের সাথে সংশ্রব রাখা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, 'যারা সুদ খায়, সুদ দেয়, সুদের হিসাব লিখে এবং সুদের সাক্ষ্য দেয়, রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ওপর লানত করেছেন এবং এরা অপরাধের ক্ষেত্রে সকলেই সমান।

পবিত্র কুরআনে বহু ধরনের গুনাহের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। সেসবের জন্য কঠোর শাস্তি ও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে যত কঠোর ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে অন্য কোনো গুনাহের ব্যাপারে এমনটি করা হয়নি। এজন্যই সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সুদ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

মানবজাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করে ও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক গবেষণা হতে সুদের ছোট-বড় অন্ততঃ পঞ্চাশটি কুফলের সন্ধান পাওয়া গেছে। সেগুলোকে নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক ইত্যাদি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। সেসবের পুনরুক্তি না ঘটিয়ে এবং অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কুফলের প্রসঙ্গে না গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কুফলগুলো সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো–

নৈতিক ও সামাজিক কুফল

১. <u>সুদ সমাজ শোষণের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম :</u> একদল লোক বিনাশ্রমে অন্যের উপার্জনে ভাগ বসায় সুদের সাহায্যেই। ঋণগ্রহীতা যে কারণে টাকা ঋণ নেয় সে কাজে তার লাভ হোক বা না হোক তাকে সুদের অর্থ দিতেই হবে। এর ফলে অনেক সময় ঋণগ্রহীতাকে স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ বিক্রি করে হলেও সুদসহ আসল টাকা পরিশোধ করতে হয়। পরিণামে সে আরও দরিদ্র হয়। সমাজে শ্রেণীবৈষম্য আরও বৃদ্ধি পায়। বস্তুতঃ সুদ গ্রহীতারা সমাজের পরগাছা। এরা অন্যের উপার্জন ও সম্পদে ভাগ বসিয়ে জীবনযাপন করে। উপরন্তু বিনাশ্রমে অর্থ লাভের

ফলে সমাজের প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এদের কোনো অবদান থাকে না।

২. <u>সুদ মানুষকে স্বার্থপর ও কৃপণ বানায় :</u> অর্থলিপ্সা, কার্পণ্য ও স্বার্থপরতা সুদখোরদের কতিপয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। বিনাশ্রমে উপার্জনের আকাঙ্ক্ষা ও অর্থলিপ্সা থেকেই সুদ প্রথার জন্ম। সুদের মাধ্যমে নিশ্চিত ও নির্ধারিত আয় প্রাপ্তির লোভ সুদখোরদের বিচার-বিবেচনা, আবেগ-অনুভূতি এমনকি বিবেককে পর্যন্ত অকেজো বানিয়ে দেয়। সুদখোরদের মধ্যে লোভ ও স্বার্থপরতা ক্রমে ক্রমে এতদূর প্রসার লাভ করে এবং তাদের আচার-আচরণে এতখানি পরিবর্তন ঘটে যে, তারা সমাজে হয়ে ওঠে পরিহাসের পাত্র। তাদের প্রবাদতুল্য লোভ, পরের সম্পদ ও বিত্ত গ্রাসের প্রবণতা গল্প-কাহিনীর খোরাক হয়ে ওঠে এবং এক সময় তা 'যামানার কারুন'দের রূপ লাভ করে।

৩. <u>সুদ শ্রমবিমুখতা ও অলসতা সৃষ্টি করে :</u> সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যাংকে অর্থ জমা রাখলে কোনো পরিশ্রম ও ঝুঁকি ছাড়াই সুদের মাধ্যমে নির্ধারিত হারে অর্থ পাওয়া যায়। এই ব্যবস্থা যোগ্যতাসম্পন্ন, প্রতিভাবান ও কর্মঠ লোককেও অকর্মণ্য ও অলস বানিয়ে দেয়। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কারখানা স্থাপন অর্থাৎ উৎপাদনধর্মী কাজে যে চিন্তা-ভাবনা, পরিকল্পনা, পরিশ্রম ও ঝুঁকি গ্রহণের দরকার সুদভিত্তিক সঞ্চয়কারীরা তা আর করে না। বরং ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থ হতে বিনাশ্রমে নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত হারে আয় পেয়ে তারা পরিতৃপ্ত থাকে। ধীরে ধীরে আলস্য তাদের গ্রাস করে। এভাবে সুদের কারণেই যাদের হাতে অঢেল বিত্ত রয়েছে তাদের শ্রম, মেধা, দক্ষতা ও যোগ্যতার ফসল হতে সমাজ বঞ্চিত হয়। সৃষ্টি হয় শ্রমবিমুখতা ও অলসতা।

৪. <u>সুদ স্বল্প লাভজনক সামাজিক প্রয়োজনীয় খাতে বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করে :</u> সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে, তা উৎপাদনমুখীই হোক আর সেবামূলকই হোক, একই হারে মুনাফা

হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুনাফার হার সুদের হারের চেয়ে বেশি, কোথাও সমান, আবার কোথাও বা কম। সাধারণভাবে বিলাস সামগ্রী ও সমাজের জন্যে অকল্যাণকর খাতে উৎপাদন ও ব্যবসায়ে মুনাফার হার হয়ে থাকে সর্বোচ্চ। প্রসাধনী ও বিলাস সামগ্রী, সৌখিন দ্রব্য, মদ ও নেশার বস্তু এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পক্ষান্তরে সমাজের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ও কল্যাণকর দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার ক্ষেত্রে মুনাফার হার খুব কম হয়ে থাকে। এমনকি তা প্রদেয় সুদের হারের চেয়েও কম হতে পারে। ফলে সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে যেখানে মুনাফার হার সুদের হারের চেয়ে বেশি সেখানেই বিনিয়োগ হয় সর্বাধিক। অপরদিকে যেসব অত্যাবশ্যকীয় খাতে মুনাফার হার সুদের হারের সমান বা কম সেখানে কোনো বিনিয়োগকারী এগিয়ে আসতে আগ্রহী হয় না। কারণ গৃহীত ঋণের সুদ প্রদানের পর উদ্যোক্তার আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। পরিণামে সামাজিকভাবে কাম্য সেবা ও দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন ও সরবরাহে সংকোচন ঘটে অনিবার্যভাবেই। অথচ সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে এই খাতে বিনিয়োগ সবচেয়ে জরুরি। যদি অর্থনীতিতে সুদ না থাকতো তাহলে বিনিয়োগকারীরা [এবং মূলধনের যোগানদাররাও] প্রাপ্তব্য মুনাফাতেই [তার হার যত কমই হোক না কেন] পুঁজি বিনিয়োগে দ্বিধা করত না। ফলে সমাজের অপরিহার্য ও কল্যাণকর খাতের সম্প্রসারণ ও কর্মোদ্যোগের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হত।

৫. <u>সুদ নৈতিক অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ :</u> সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে নিশ্চিত আয়ের অর্থাৎ অবধারিতভাবে সুদ প্রাপ্তির লোভে অনৈতিক ও অনৈসলামী কাজে মূলধন বিনিয়োগ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ মদের ব্যবসা, ফটকাবাজারী, মজুতদারী, অনৈতিক ও কুরুচিপূর্ণ গান-বাজনা, সিনেমা, এমনকি পর্ণোগ্রাফির মতো বিষয়ে পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে। এসব কাজে যেহেতু মুনাফা অর্জিত হয় তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি হারে, সেহেতু প্রদেয় সুদ

পরিশোধের পরও বিস্তর মুনাফা থেকে যায় উদ্যোক্তার হাতে। তাই তার পক্ষে চড়া হারেও সুদ পরিশোধ করা কোনো কঠিন বিষয় হয় না। এই পথ ধরে সমাজে অনৈতিক ও অসামাজিক কাজের প্রসার ঘটে সহজেই। পরিণামে লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী ও কিশোর-কিশোরীর সহজাত বোধ-বিশ্বাসে চিড় ধরে। ধীরে ধীরে তাদের ঈমানী চেতনার বিলুপ্তি ঘটতে শুরু করে। ক্রমেই মূল্যবোধের ক্ষয় হয় এবং প্রায় অলক্ষ্যেই সমাজে নৈতিক অধঃপতন গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসে। ফলে সমাজের অবক্ষয় তথা ধ্বংস হয়ে ওঠে অবশ্যম্ভাবী ও অপ্রতিরোধ্য।

৬. <u>সুদ সমাজে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে :</u> সুদখোর মহাজন ও পুঁজিপতিরা তাদের প্রদত্ত ঋণের বিনিময়ে হাজার হাজার লোকের কঠোর শ্রমের ফসলে অন্যায্য ভাগ বসায়। শুধু তাই নয়, অনুৎপাদনশীল কাজের জন্য গৃহীত ঋণের বিপরীতে যেহেতু কোনো বাড়তি আয়ের সুযোগ নেই সেহেতু এই ঋণ পরিশোধ করতে ঋণগ্রহীতার সহায়-সম্পত্তির ওপরেও চাপ পড়ে অনিবার্যভাবেই। এমনকি ঋণের দায়ে অনেকের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক হয়, পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি নিলামে ওঠে। মানুষের আপদকালে দাবিকৃত বাড়তি এই অর্থ অর্থাৎ সুদ তাই স্বভাবতই ঋণগ্রহীতাদের ক্ষুব্ধ করে তোলে। মানুষ তাদেরকে বিপদের দিনে দাতা মনে করার পরিবর্তে রক্তচোষা রূপেই স্মরণ করে। ফলে সুদখোররা সমাজে হয়ে ওঠে ঘৃণার পাত্র।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান না থাকায় বাইতুল মাল হতে সাহায্য বা করযে হাসানা পাওয়ার কোনো সুযোগ না থাকায় সুদভিত্তিক ঋণ নিতে বাধ্য হয় সমস্যাগস্ত নারী-পুরুষ। উপরন্তু সুদখোররা গরীব ও অসহায় কৃষকদের জমি-জিরাত ঋণের দায়ে দখল করে, ফসলের সুদ খেয়ে খেয়ে ধীরে ধীরে ফুলে ফেঁপে ওঠে, হয়ে ওঠে বিপুল সম্পদের মালিক। কখনও কখনও এমনও দেখা যায়, গৃহস্থ চাষী, ক্ষুদে খামারের মালিক সুদখোর মহাজনের ঐ জমিতে বর্গাচাষ করতে বাধ্য হচ্ছে, একদিন যে জমির মালিক ছিল সে নিজেই।

স্বভাবতই তখন তার মনে সৃষ্টি হয় বিদ্বেষ ও আক্রোশ; যার পরিণাম মোটেই শুভ নয়।

৭. **সুদের কারণে দরিদ্র আরও দরিদ্র এবং ধনী আরো ধনী হয় :** সুদের পরিণামে সামাজিক শ্রেণীবৈষম্য বেড়েই চলে। দরিদ্র অভাবগ্রস্ত মানুষ প্রয়োজনের সময় সাহায্যের কোনো দরজা খোলা না পেয়ে উপায়ন্তর না দেখে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। সেই ঋণ উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল উভয় প্রকার কাজেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিশেষ করে অনুৎপাদনশীল কাজে ঋণের অর্থ ব্যবহারের ফলে তার ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা লোপ পায়। পুঁজিবাদী সমাজে করযে হাসানার কোনো সুযোগ না থাকায় অনুৎপাদনী খাতে ঋণ তো দূরের কথা, উৎপাদনী খাতেও বিনা সুদে ঋণ মেলে না। বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো তাকে সুদ পরিশোধ করতে হয়। এর ফলে সে তার শেষ সম্বল যা থাকে তাই বিক্রি করে ঋণ শোধ করে থাকে। এই বাড়তি অর্থ পেয়ে ধনী আরো ধনী হয়। আর দরিদ্র হয় আরও দরিদ্র। ফলে বৃদ্ধি পেতে থাকে সামাজিক শ্রেণীবৈষম্য।

সুদের অর্থনৈতিক কুফল

১. **সুদের শোষণ সার্বিক, দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক :** সুদভিত্তিক ব্যাংক ও বীমা ব্যবসার কারণে ছোট ছোট সঞ্চয় সমাবেশ ও সঞ্চালনের সুযোগে বিরাট পুঁজি গড়ে উঠছে। বীমা ও ব্যাংক ব্যবসায়ে নিযুক্ত মুষ্টিমেয় ব্যক্তি এই পুঁজি চড়া সুদে ঋণ দিয়ে বিপুল অর্থ উপার্জন করছে। একই সাথে ঋণ দেবার ক্ষেত্রে ধনী ও দরিদ্রের বাছ-বিচারের কারণে সৃষ্টি হচ্ছে ব্যাপক শ্রেণীবৈষম্য। অর্থাৎ শ্রেণীবৈষম্য হ্রাস না পেয়ে আরও ব্যাপক, গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে। উপরন্তু বাংলাদেশের সুদী ব্যাংকসমূহের অনেকগুলো তাদের প্রদত্ত সুদকে ক্ষেত্রবিশেষে 'মুনাফার' লেবাস পরিয়ে চালিয়ে দেবার অপচেষ্টাও করছে। ফলে প্রতারিত হচ্ছে সরলপ্রাণ ধর্মভীরু মানুষ।

সুদভিত্তিক ব্যাংকিং পদ্ধতিতে শোষণ যে কত সার্বিক ও কৌশলপূর্ণ তা একটা উদাহরণের সাহায্যে তুলে ধরা যায়। ব্যাংকে আমানতকারীরা যে অর্থ সঞ্চিত রাখে তার পুরোটা ব্যাংক কখনই নিজের কাছে গচ্ছিত রাখে না। সাধারণতঃ ঐ অর্থের ৯০% ঋণ দিয়ে থাকে ব্যবসায়ী-বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তাদের। তারা এই অর্থের জন্য ব্যাংককে যে সুদ দেয় তা আদায় করে নেয় জনগণের নিকট হতে তাদের প্রদত্ত সেবা ও পণ্যসামগ্রীর মূল্যের সঙ্গেই। এদের মধ্যে ঐসব আমানতকারীরাও রয়েছে যারা ব্যাংকে অর্থ রেখেছে সুদের মাধ্যমে নিশ্চিত নিরাপদ আয়ের উদ্দেশ্যে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আদায়কৃত সুদ হতে একটা অংশ ব্যাংক পরিচালনা ও শেয়ার হোল্ডারদের ডিভিডেন্ডের জন্য রেখে বাকি অংশ আমানতকারীদের হিসাবে জমা করে দেয় তাদের প্রাপ্য সুদ বাবদ। এভাবেই ব্যাংক ও অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানগুলো মাছের তেলে মাছ ভেঁজে নেয়। অন্যদিকে প্রতারিত হয় আমানতকারীরা। কিন্তু তারা কি কখনও তা তলিয়ে দেখার অবকাশ পায়? বরং বছর শেষে পাশ বই বা কম্পিউটারাইজড একাউন্ট শীটে যখন জমার বিপরীতে সুদ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ দেখে তখন তারা দৃশ্যতঃ পুলকিতই হয়!

২. <u>সুদের কারণে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে</u>: কৃষকেরা ফসল ফলাবার তাগিদে নিজেরা খেতে না পেলেও ঋণ করে জমি চাষ করে থাকে। প্রয়োজনের সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পাওয়া এদের জন্যে দুরূহ। তাই গ্রামেরই সচ্ছল লোকের দ্বারস্থ হয় তারা। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে একদল লোক এদেরকে সাহায্য করার জন্যে তৈরিই থাকে! গ্রামাঞ্চলে এসব সুদখোররা সাধারণতঃ 'মহাজন' নামে অধিক পরিচিত। এরা শুধু গ্রামাঞ্চলেই আছে এমন নয়, নগরে-বন্দরে, গঞ্জে-মোকামেও এরা পরিচিত মুখ। এদের অনেকে আবার দাদন ব্যবসায়ী হিসাবেও পরিচিত। এরা প্রান্তিক কৃষক, বর্গাচাষী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সকলকেই টাকা ধার দেয়, ধান যোগান দেয়। শর্ত থাকে, ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত

প্রতিমাসে প্রতি হাজারে ২০০টাকা হারে সুদ দিতে হবে। অথবা প্রতি মণ ধানের বদলে ঐ সময়ে দ্বিগুণ ধান দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। ফলে দেখা যায়, ফসল তোলার পর নগদ অর্থ বা ফসলের সুদসহ ঋণ পরিশোধের পর কৃষকের হাতে আর তেমন কিছুই উদ্বৃত্ত থাকে না। তাকে আবার ঋণ করতে হয় সংসার চালাবার জন্যে। ঋণের এই অশুভ চক্র হতে সে বেরিয়ে আসতে পারে না। ক্রমেই তার ঋণের পরিমাণ বাড়ে। এক সময়ে জমি-জিরাত ভিটেমাটি দখল করে নেয় জমিখেকো মহাজনরা।

কৃষকরা এই ঋণ শুধু যে গ্রামের মহাজনের কাছ থেকেই নেয় তা নয়। সরকারের কৃষি ব্যাংক থেকেও নেয়, নেয় অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ও সমবায় প্রতিষ্ঠান থেকেও। যথোপযুক্ত বা আশানুরূপ ফসল হওয়া সব সময়েই অনিশ্চিত। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ তো রয়েছেই। যদি ফসল আশানুরূপ না হয় বা আকস্মিক বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ফসল খুবই কম হয় বা মোটেই না হয় তবু কিন্তু কৃষককে নির্দিষ্ট সময়ান্তে সুদসহ ঋণ পরিশোধ করতে হয়। তখন হয় তাকে আবার নতুন ঋণের সন্ধানে বের হতে হয় অথবা জমি-জিরাত বেচে কিংবা বন্ধক রেখে সুদ আসলসহ ঋণ পরিশোধ করতে হয়। তা না হলে, মহাজন বা ব্যাংক আদালতে নালিশ ঠুকে তার সহায়-সম্পত্তি ক্রোক করিয়ে নিবে। দেনার দায়ে নিলামে চড়াবে।

৩. <u>সুদের ফলে একচেটিয়া কারবারের প্রসার ঘটে :</u> বড় বড় ব্যবসায়ীরা যে শর্তে ও যে সময়ের জন্য ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ পেতে পারে ছোট ব্যবসায়ীরা সেভাবে ঋণ পায় না। এজন্য প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও তারতম্য ঘটে। সে প্রতিযোগিতায় অসম সুবিধা ভোগের সুযোগ নিয়ে বড় কারবারী বা ব্যবসায়ী আরো বড় হয়। ছোট কারবারী বা ব্যবসায়ী টিকতে না পেরে ধ্বংস হয়ে যায়। বৃহদায়তন শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তাই। এই জাতীয় শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শুধু ব্যাংকই নয়, বিনিয়োগ কোম্পানী ও অনৈসলামী সরকারসমূহ যে

বিশেষ সুবিধা ও ন্যূনতম সুদের হারে টাকা ঋণ দিয়ে থাকে, ছোট বা ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের জন্য আদৌ সে সুযোগ নেই। ফলে বড় শিল্পপতিরা প্রতিযোগিতাহীন বাজারে একচেটিয়া কারবারের সমস্ত সুযোগ লাভ করে। পরিণামে অর্থনৈতিক বৈষম্য আরো প্রকট হয়।

৪. <u>সুদের কারণে মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই পুঁজি আবর্তিত হয় :</u> সুদ আদায় ও প্রদানের সামর্থের কারণে বিত্তবান ঋণদাতা ও গ্রহীতাদের হাতে পুঁজি আবর্তিত হতে ও বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান, বিনিয়োগ কোম্পানী তথা অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান এবং ধনিক শ্রেণীর মধ্যে একটা অদৃশ্য সেতুবন্ধন বা যোগসাজেশ লক্ষ্য করা যায়। উপরন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে, অবৈধভাবে বা অন্য কোনো উপায়ে কেউ প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করতে পারলে সুদের বদৌলতেই সে তা ক্রমাগত বৃদ্ধি করে যেতে পারে। পক্ষান্তরে পর্যাপ্ত জামানত দিতে না পারার কারণে স্বল্পবিত্তদের এখানে কোনো ঠাঁই নেই। ফলে বিত্তশালীরা একাধারে সমাজকে শোষণ করে এবং একচেটিয়া কারবারেরও প্রসার ঘটে। সমাজে সৃষ্টি হয় অর্থনৈতিক বিপর্যয়। এজন্যেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে বলেছেন, "[সম্পদ তোমরা এমনভাবে বণ্টন করবে] যেন তা [কেবল] তোমাদের [সমাজের] বিত্তশালী লোকদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়" [সূরা হাশর, আয়াত : ৭]

৫. <u>সুদ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ :</u> সুদবিহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনকারী উৎপাদন খরচের ওপর পরিবহন খরচ, শুল্ক [যদি থাকে], অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় এবং স্বাভাবিক মুনাফা যোগ করে পণ্যসামগ্রীর বিক্রি মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। কিন্তু সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে দ্রব্যের এই স্বাভাবিক মূল্যের ওপর উপর্যুপরি সুদ যোগ করে দেওয়া হয়। দ্রব্য বিশেষের ওপর তিন থেকে চার বার পর্যন্ত, ক্ষেত্রবিশেষে তারও বেশিবার সুদ যুক্ত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ আমাদের দেশের বস্ত্রশিল্পের কথাই ধরা যেতে পারে। এই শিল্পের প্রয়োজনে তুলা আমদানী করতে

হয়। আমদানীকারকরা বিদেশ থেকে তুলা আমদানীর জন্য ব্যাংক হতে যে ঋণ নেয় তার সুদ যুক্ত হয় ঐ তুলার বিক্রয় মূল্যের ওপর। এরপর সুতা তৈরির মিল ব্যাংক হতে যে ঋণ নেয় তারও সুদ যুক্ত হয় ঐ তুলা থেকে তৈরি সুতার ওপর। পুনরায় ঐ সুতা হতে কাপড় তৈরির সময়ে বস্ত্রকল সংস্থা বা কোম্পানী যে ঋণ নেয় সেই সুদ যুক্ত হয় কাপড়ের ওপর। এরপর কাপড়ের এজেন্ট বা ডিলার তার ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যাংক হতে যে ঋণ নেয় তারও সুদ যোগ করে দেয় ঐ কাপড়ের কারখানা মূল্যের ওপর। এভাবে চারটি স্তর বা পর্যায়ে সুদের অর্থ যুক্ত হয়ে বাজারে কাপড় যখন খুচরা দোকানে আসে বা প্রকৃত ভোক্তা ক্রয় করে তখন সে আসল মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি দাম দিয়ে থাকে।

এভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির প্রত্যেকটিতেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সুদ জড়িয়ে আছে। ফলে নিরুপায় ভোক্তাকে বাধ্য হয়েই সুদের জন্যে সৃষ্ট এই চড়া মূল্য দিতে হয়। কারণ সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে এছাড়া তার গত্যন্তর নেই। অথচ সুদ না থাকলে অর্থাৎ ইসলামী অর্থনীতি চালু থাকলে এই জুলুম হতে জনসাধারণ রেহাই পেত। এতে শুধু তাদের জীবন যাত্রার ব্যয়ই কম হত না, জীবন যাপনের মান হত আরো উন্নত।

৬. <u>সুদ মজুরী বৃদ্ধির অন্যতম বড় প্রতিবন্ধক :</u> সুদের হার বেশি থাকলে শিল্প উদ্যোক্তাদের পক্ষে মুনাফা অর্জনই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সে সময়ে মজুরী বৃদ্ধি মানেই লোকসানের ঝুঁকি নেওয়া। আবার সুদের হার খুব কম থাকলে বিনিয়োগকারীর সংখ্যা হয়তো বেশি হয় কিন্তু পুঁজির সরবরাহ বৃদ্ধি পায় না। সেক্ষেত্রে বিনিয়োগ কম হওয়ার ফলে শ্রমিকের চাহিদাও কম থাকে। অন্যদিকে চাহিদার তুলনায় শ্রমিকের যোগান অনেক বেশি থাকায় শ্রমিকদের দিক থেকে মজুরী বৃদ্ধির দাবি উত্থাপন আদৌ সহজ হয় না। উপরন্ত বিদ্যমান কম মজুরীতেই চাহিদার চেয়ে শ্রমিকের যোগান বেশি হওয়ায় উদ্যোক্তারা মজুরী বৃদ্ধির দাবি সহজে মেনে নিতে চায় না। ফলে অনিবার্যভাবেই সংঘাত দেখা দেয়। শ্রমিকরা

কর্মবিরতি, ঘেরাও, ধীরে চলো, ধর্মঘট, হরতাল, অবস্থান ধর্মঘট প্রভৃতি কর্মসূচির আশ্রয় নেয়। পরিণামে মালিক পক্ষ ছাটাই, লেঅফ, লক আউট ইত্যাদি কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। পূর্বেই বলা হয়েছে, সুদের কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। ফলে বিক্রিও হ্রাস পায়। এই অবস্থায় মজুরী বৃদ্ধি পেলে মুনাফার হার হ্রাস পেয়ে সুদের হারের চেয়েও নিচে নেমে যেতে পারে। তাই মজুরী বৃদ্ধির কোনো দাবিই শিল্প মালিকদের পক্ষে বিবেচনায় আনা সম্ভব হয় না।

৭. **সুদ দীর্ঘ মেয়াদী বৃহৎ বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করে :** সুদনির্ভর ব্যাংক ব্যবস্থায় ব্যাংকগুলো দীর্ঘ সময় ধরে পুঁজি আটকে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে এমন ধরনের বিনিয়োগে আদৌ উৎসাহ দেখায় না। এজন্যেই ব্যয়বহুল বড় শিল্প-কারখানা সুদী ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে উঠতে পারে না। এসব শিল্প-কারখানা স্থাপনে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয় তা সুদের ভিত্তিতে যোগান দিলে প্রতি বছর বিপুল অংকের অর্থ সুদ হিসাবে পরিশোধ করতে হবে। বড় বড় মিল-কারখানা সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠিত হয়ে চালু হতে দুই হতে তিন বছরের প্রয়োজন হয়। এই দীর্ঘ সময়ে সুদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে এমন অংক দাঁড়াবে যে, সে বোঝা বহন করা লাভজনক শিল্পের পক্ষেও সম্ভব নয়। আর লোকসান হলে সুদে-আসলে ঋণের যে অংক দাঁড়ায় তা পরিশোধ করা কখনো সম্ভব হয় না। স্বাভাবিকভাবেই উদ্যোক্তা তখন দেউলিয়া হতে বাধ্য হয়। একমাত্র মতলববাজ ঋণখেলাপীরাই তথ্যবিকৃতি ঘটিয়ে শিল্প বা কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্যে ব্যাংক হতে বড় আকারের বিনিয়োগ গ্রহণ করে। তারপর কারখানা গড়ে তুললেও তারা আর কখনও ঋণ পরিশোধ করে না। বছরের পর বছর গড়িয়ে যায়। এর অশুভ প্রতিক্রিয়ার শিকার হয় দেশের অর্থনীতি।

৮. **সুদের কারণে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে :** পূর্বে দেখানো হয়েছে যে, সুদের কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়

অবশ্যম্ভাবীভাবে ও অপ্রতিহত গতিতে। উপরন্তু অব্যাহত মুদ্রাস্ফীতি ঘটার অন্যতম কারণও সুদ। এই দুইয়ের যোগফলে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস ওঠে। নির্দিষ্ট আয়ের শ্রমজীবী, সাধারণ কৃষিজীবী, নানা ধরনের পেশাজীবী ও বেতনভুক্ত কর্মচারীরা এই সাধারণ মানুষের কাতারে শামিল। এদের আয়ের স্তর ও পরিমাণ যেহেতু মোটামুটি একটা দীর্ঘ সময় ধরে একই রকম থাকে সেহেতু দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির ফলে ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে একদিকে জীবন যাপনের মানের অবনতি ঘটে, অন্যদিকে বাজারে কার্যকর চাহিদারও সংকোচন ঘটে। এরই চূড়ান্ত পরিণাম হিসাবে কলকারখানায় মুনাফার পরিমাণ হ্রাস পায়, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনাও রুদ্ধ হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে মুনাফার পরিমাণ ঠিক রাখার জন্যে পুনরায় মূল্যবৃদ্ধি ঘটায় শিল্প-উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীরা। জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা তখন কমে যায় আরও এক ধাপ।

৯. <u>সুদভিত্তিক ঋণে তৈরি প্রতিষ্ঠান ক্ষতির সম্মুখীন হলে উদ্যোক্তা পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে :</u> উদ্যোক্তা যতক্ষণ ব্যাংকের সুদ পরিশোধ করে ততক্ষণ ব্যাংক তার ঋণ মঞ্জুরী অব্যাহত রাখে। এমনকি ঋণের পরিমাণও বৃদ্ধি করে। কিন্তু যখনই কারবারে লোকসান দেখা দেয়, তখন ব্যাংক নতুন অর্থলগ্নি করা দূরে থাক পূর্বের ঋণ ফেরত দেবার জন্যেই চাপ দেয়। এই অবস্থায় উদ্যোক্তা মাথায় হাত দেয়। কারণ তার নিজের পুঁজি ছিল সামান্যই, পুরো ব্যাপারটি ছিল পরের ধনে পোদ্দারী। ফলে এই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় না। পরিণামে গোটা কারবারটি বন্ধ বা ধ্বংস হয়ে যায়।

১০. <u>সুদভিত্তিক ঋণের কারণে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়াত্বের বোঝা সমগ্র জাতির ঘাড়ে চাপেঃ</u> ধনী ব্যবসায়ী বা শিল্পপতিরা নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদানের অঙ্গীকারে তাদের দেওয়া জামানতের বিপরীতে ব্যাংক ও অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলো হতে

দশগুণ বা তারও বেশি পরিমাণ ঋণ পেয়ে থাকে। অর্থাৎ নিজেদের দশ লক্ষ টাকা থাকলে তারা এক কোটি টাকা ঋণ পায়। এক্ষেত্রে অনেক সময় রাজনৈতিক প্রভাব বা সম্পৃক্ততাও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কোটি টাকারও বেশি এই অর্থের ব্যবসা বা শিল্পে যে মুনাফা হয় তার সবটুকুই ভোগ করে ঐ ঋণগ্রহণকারী উদ্যোক্তা। ব্যাংকে অর্থ আমানতকারীরা সুদ পেলেও মুনাফার কোনো অংশই তারা পায় না। অথচ লোকসানের কারণে ঐ প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হলে তার দায়ভার চাপে গোটা জাতির ওপর । জনগণের সঞ্চয় তখন আর ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তার দৃশ্যমান লোকসান ঐ দশ লক্ষ টাকা হলেও [যদিও পূর্বের মুনাফা সে পুরোটা একাই ভোগ করেছে] জনসাধারণের লোকসান অনেক ক্ষেত্রে পুরো কোটি টাকাই। কষ্ট করে এই টাকা যারা সঞ্চয় করে ব্যাংকে আমানত রেখেছিল তাদেরই এখন ফতুর হবার পালা।

১১. <u>সুদের দীর্ঘমেয়াদী কুফলস্বরূপ অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দেয় :</u> সুদভিত্তিক বিনিয়োগ ও ব্যবসার কারণে অর্থনীতিতে বারবার মন্দা ও তেজীভাবের আবর্তন হতে থাকে। এর ফলে সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সব সময় অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা বিরাজ করে। যে কোনো অর্থনীতির জন্যে এ অবস্থা অনাকাঙ্ক্ষিত। অর্থনীতিতে যখন তেজীভাব থাকে তখন সুদের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে সুদের হার যখন অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায় তখন ঋণগ্রহীতারা হিসাব করে যদি দেখে যে অতিরিক্ত সুদের হারের কারণে লাভের সম্ভাবনা কম, তখন তারা ঋণ নেওয়া বন্ধ করে দেয়। তখন পুঁজি বিনিয়োগে ভাটা পড়ে, উৎপাদন কমে যায়, শ্রমিক ছাটাই হয়, ব্যবসায়ে সৃষ্টি হয় মন্দা। এভাবে পুঁজির চাহিদা কমে গেলে বিনিয়োগ বৃদ্ধির আশায় ব্যাংক সুদের হার কমিয়ে দেয়। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা নতুন করে ঋণ নিয়ে তখন উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দেয়। ক্রমে মন্দা কেটে গিয়ে পুনরায় তেজীভাবের সৃষ্টি হয়। এভাবে বারবার মন্দা

ও তেজী অবস্থার সৃষ্টি অর্থনীতির জন্যে যে অত্যন্ত অশুভ ও ভয়াবহ পরিণতির জন্ম দেয় সে বিষয়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতির শ্রেষ্ঠ প্রবক্তারাও একমত।

সুদের রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক কুফল

১. <u>সুদ বৈদেশিক ঋণের বোঝা বাড়ায় :</u> উন্নয়নশীল দেশের সরকার প্রায়ই শিল্প ও অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো বিনির্মাণের জন্য বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। ঐসব ঋণ নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে সুদসহ পরিশোধযোগ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, প্রায়ই দেখা যায় ঐসব ঋণ না নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফেরত দেওয়া যায়, না উপযুক্তভাবে কাজে লাগিয়ে কাঙ্ক্ষিত উন্নতি অর্জন করা যায়। ফলে ঋণ পরিশোধ তো দূরের কথা, অনেক সময় শুধু সুদ পরিশোধ দায় হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় পূর্বের ঋণ পরিশোধের জন্য এসব দেশ আবার নতুন করে ঋণ গ্রহণ করে। এই নতুন ঋণ সুদে-আসলে পূর্বের ঋণকে ছাড়িয়ে যায় এবং প্রকৃত প্রস্তাবে সুদ-আসলে সমুদয় ঋণই বোঝা হয়ে জনগণের কাঁধে চাপে।

অনুরূপভাবে দেশে কোনো বিপর্যয় বা সংকট দেখা দিলে অথবা খাদ্যশস্যের মতো অপরিহার্য পণ্যের ঘাটতি ঘটলে তা পূরণের জন্য সরকারকে বন্ধু দেশ বা ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিতে হয়। ভোগের জন্যে গৃহীত এই ঋণের বিপরীতে যেহেতু কোনো উৎপাদন বা কর্মসংস্থান হয় না, সেহেতু এই ঋণের আসল পরিশোধ তো দূরের কথা, যথাসময়ে সুদই পরিশোধ করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে সরকারকে হয় বাড়তি কর আরোপ করে এই অর্থ জনগণের কাছ থেকেই সংগ্রহ করতে হয়, নয়তো আবারও ঋণ নিতে হয়।

২. <u>সুদের কারণেই ধনী ও দরিদ্র দেশের প্রকৃত সম্পর্ক হয় শোষক-শোষিতের :</u> বর্তমান বিশ্বের দেশগুলোকে প্রধানতঃ দু'টি অভিধায় বিভক্ত করা হয়ে থাকে– ধনী ও দরিদ্র। খুব সম্মান রেখে বললে বলা হয় উন্নত ও উন্নয়নশীল। দরিদ্র দেশগুলো সকলেই প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র নয়। তাদের রয়েছে পর্যাপ্ত মানব সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ। কিন্তু এই দুই সম্পদ

কাজে লাগাবার জন্য তাদের যেমন নেই আধুনিক প্রযুক্তি তেমনি নেই পর্যাপ্ত অর্থ। এই সুযোগটাই কাজে লাগাতে চেষ্টা করে ধনী দেশগুলো। পৃথকভাবে কোনো একটি দেশ নয়, বরং ইউরোপের ধনী দেশগুলোর আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল [IMF], মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাংক এবং এশিয়ার ধনী দেশগুলোর এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক জোটবদ্ধভাবে প্রাকৃতিক সম্পদশালী কিন্তু আপাতঃ দরিদ্র দেশগুলোকে তাদের হাতের মুঠোয় রাখতে বদ্ধপরিকর। সেজন্যে এদের কৌশলের অন্ত নেই। এদের প্রধান কাজ হলো বিশেষজ্ঞ পরামর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিশাল বিশাল প্রকল্প তৈরি ও গ্রহণ করিয়ে আর্থিক সহযোগিতার নামে চড়া সুদে বিপুল পরিমাণ ঋণ গ্রহণে প্ররোচিত করা এবং দীর্ঘমেয়াদে শোষণ করা। ছলে-বলে-কৌশলে তারা এই কাজটা অব্যাহতভাবে করে চলেছে।

একবার ঋণের ফাঁস এসব দেশের গলায় পরাতে পারলে তাদের মতলব হাসিল হয়ে যায়। তখন যেমন রাজনৈতিকভাবে এদেরকে চাপে রাখা যায়, তেমনি অর্থনৈতিকভাবে এসব দেশকে শোষণের পথও সুগম হয়ে যায়। এই শোষণ যেমন দীর্ঘমেয়াদী তেমনি এর প্রকৃতিও ভয়াবহ। শুধু গৃহীত ঋণের সুদ বাবদ তখন প্রতি বছর হাজার কোটি টাকার ওপর পরিশোধ করতে হয়। বাংলাদেশ গত ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে সুদ বাবদই পরিশোধ করেছে বাংলাদেশী মুদ্রায় ১৩১১ কোটি টাকা। [সূত্র : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৯; পৃ. ২৫১, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার]

ফলশ্রুতিতে সংশ্লিষ্ট দেশের গুরুত্বপূর্ণ সব প্রতিষ্ঠান যেমন রাজনৈতিক দল, সাহিত্য সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, সংবাদপত্র, পার্লামেন্ট এমনকি ধর্মচর্চার কেন্দ্রগুলোও ক্রমেই ঋণদাতা দেশগুলোর কর্তৃত্বের আওতায় চলে আসে। পুঁজিপতিরা যেভাবে চায় সে ধরনের সরকারই এসব দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই সরকারের যাবতীয় পলিসিও তাদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য এরাই কৌশলপত্র তৈরির নির্দেশ দেয় এবং সেই কৌশলপত্রও এদের তত্ত্বাবধানেই তৈরি হয়, যার গূঢ় উদ্দেশ্য দারিদ্র্য বিমোচন নয়; বরং দারিদ্র্যের প্রসার, তৃণমূল পর্যায়ের মানুষদের আরও বেশি পরমুখাপেক্ষী করে তোলা।

উন্নত ধনী দেশগুলোর সাথে দরিদ্র দেশগুলোর বৈষম্য যে ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে তার অন্যতম প্রধান কারণ সুদী ঋণ ব্যবস্থা। সুদভিত্তিক বৈদেশিক

ঋণ দুনিয়ার দরিদ্র দেশগুলোর জন্য অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উন্নত দেশগুলোর সুদভিত্তিক ঋণ আজ আন্তর্জাতিক শোষণের মুখ্য হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে, যা সাম্রাজ্যবাদেরই আরেক নতুন রূপ। এরই কারণে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। এ সম্পর্ক এখন কার্যতঃ শোষক ও শোষিতের।

প্রশ্ন : সুদের সর্বগ্রাসী সয়লাব থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় আছে কি?

উত্তর : হ্যাঁ, সুদের সর্বগ্রাসী সয়লাব এবং এর ধ্বংসাত্মক কুফল থেকে পরিত্রাণের উপায় আছে। সেগুলো আমি নিম্নে তুলে ধরছি। তবে তার আগে জেনে রাখা প্রয়োজন যে, ইসলামী খিলাফতের দীর্ঘ নয়শত বছরে মুসলিম বিশ্বে কোথাও সুদপ্রথা বিদ্যমান ছিল না। যখন মুসলমানদের পতনদশা শুরু হয় তখন পাশ্চাত্যের ধনবাদী আগ্রাসী শক্তি একে একে মুসলিম দেশসমূহ গ্রাস করতে শুরু করে। ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সৃষ্টি হয় চরম নাজুক অবস্থা। ব্যবসা-বাণিজ্য, ভূ-সম্পত্তি সবই চলে যায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের দখলে। এই সময়েই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুদের বিস্তার শুরু হয়। দীর্ঘদিন পরে যখন এসব দেশ পুনরায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে ততদিনে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুদ গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসে যায়। সুদ উচ্ছেদের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে কোনো প্রচেষ্টাও চলেনি। অর্থবহ কোনো জোরদার কর্মসূচীও গৃহীত হয়নি। সুদ উচ্ছেদের জন্য মাত্র বিগত শতাব্দীর শেষভাগে ইসলামী পদ্ধতির ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপনের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এরপরও বাংলাদেশের মত বহু মুসলিম দেশে সুদ অর্থনৈতিক-সামাজিক ও প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে দাপটের সাথে বিরাজমান। কীভাবে একে সমাজদেহ হতে উচ্ছেদ করা যায়, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হতে কীভাবে চিরতরে দূর করা যায়, এক কথায় সুদ বর্জনের কৌশল কী হতে পারে, সে সম্বন্ধে এখানে বাস্তবধর্মী কিছু কর্মসূচী আলোচিত হলো–

<u>১. গণসচেতনতা সৃষ্টি :</u> সুদ বর্জন তথা সমাজ হতে সুদ উচ্ছেদের জন্য গণসচেতনতা সৃষ্টির বিকল্প নেই। এদেশের জনগণের প্রায় ৮৮%

লোক মুসলমান। তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য জীবন দিতেও কুণ্ঠিত নয়। কিন্তু যথার্থ ইসলামী জ্ঞানের অভাবে সুদ যে হারাম সে সম্বন্ধে অনেকেই জ্ঞাত নয়। কেউ কেউ বলেন, ঐ নির্দেশ চৌদ্দশত বছর আগে ঠিক ছিল, এখন নয় [নাউযুবিল্লাহ]। তাদের যুক্তি, ব্যাংকের সুদ ও ব্যক্তির দাবিকৃত সুদ একই পর্যায়ের বিবেচিত হতে পারে না। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে ব্যাংক ব্যবস্থার উদ্ভবই হয়নি!

আবার একদল বলেন, আরবী 'রিবা' এবং ইংরেজী Interest একই অর্থ বহন করে না। অথচ আভিধানিক ও ব্যবহারিক বিচারে রিবার অর্থ এবং ইংরেজী Interest-এর ব্যবহারিক অর্থ একই দাঁড়ায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা ব্যবসা হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন'। [সূরা বাকারা, আয়াত : ২৭৫]

দেশের সাধারণ জনগণের বিপুল অংশ প্রকৃতপক্ষে আল-কুরআনের এই নির্দেশ সম্বন্ধে অবগত নয়। এজন্যই তাদের কাছে এই ইলাহী নির্দেশ যথাযথ গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা অতীব জরুরি। সুদের ক্ষতিকর দিক সম্বন্ধে প্রথমেই যে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরা দরকার তা হলো সুদের আয় যেমন হারাম, সুদের সঙ্গে যে কোনো ধরনের সংশ্লিষ্টতাও তেমনি হারাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা সুদ খায়, সুদ দেয়, সুদের হিসাব লেখে এবং সুদের সাক্ষ্য দেয় তাদের সকলের ওপর আল্লাহর লানত।

সহীহ হাদীস অনুসারে আল্লাহর কাছে দোয়া কবুল হওয়ার জন্য যে শর্তগুলো রয়েছে তার অন্যতম হলো হালাল উপায়ে উপার্জন করা এবং হালাল খাবার ভক্ষণ করা। সুতরাং একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যদি আমাদের উপার্জনই হালাল না হয় তাহলে আল্লাহর দরবারে যতই ফরিয়াদ করি না কেন, তা কবুল হওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই। সেক্ষেত্রে আমাদের সকল ইবাদত বন্দেগীই বরবাদ হয়ে যাবে। এর চূড়ান্ত পরিণতি হলো আখিরাতে আল্লাহর আযাব হতে রেহাই না পাওয়া। তাই ঈমান বজায় রাখার স্বার্থেই আমাদের হালাল রুজি অর্জনের প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং যা হারাম তা পরিত্যাগে সর্বাত্মক উদ্যোগ নিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে

হালাল অর্জন ও হারাম বর্জনের মধ্যেই রয়েছে মুমিন জীবনের যথার্থ সাফল্য। এই সাফল্য অর্জনের জন্য চাই নিরন্তর প্রয়াস।

ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমেই কেবল সুদ উচ্ছেদের লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে। জনগণের চাহিদা এবং তার দৃঢ় বহিঃপ্রকাশ ছাড়া সরকার নিজ থেকে খুব কমই তাদের উপযোগী ও প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়ে থাকে। তাই সুদ উচ্ছেদের কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে এক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। এজন্য সবার আগে চাই গণসচেতনতা। আমাদের দেশের জনগণের একটা অংশ এখনও শিক্ষিত নয়। তাই কাজটা একটু কঠিন, তবে অসম্ভব নয়। কারণ এদেশের জনগণ ধর্মভীরু। তাদের যদি যথাযথভাবে ইসলামের দাবি কী এবং তা অর্জনের উপায় কী এটা বুঝানো যায়, প্রকৃতই উদ্বুদ্ধ করা যায়, তাহলে এদেশের অর্থনীতি ও সমাজ কাঠামোয় সুদ বর্জন সময়সাপেক্ষ হতে পারে, কিন্তু অসম্ভব হবে না। এজন্য কিছু উপায় অনুসরণ করা যেতে পারে।

প্রথমত : মসজিদে জুমআর খুৎবার সাহায্য গ্রহণ। বছরে বায়ান্ন দিন এলাকার জনগণ মসজিদে জুমআর নামাজে শামিল হন। এই নামাজের খুৎবায় নানান বিষয়ের অবতারণা করা হয়। সেসব বিষয়ের পাশাপাশি যদি ইমাম সাহেব সুদী অর্থনীতির কুফল এবং তা দেশ ও জাতির জন্য কতখানি ক্ষতিকর তা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বলেন তাহলে ধীরে ধীরে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হবে।

দ্বিতীয়ত : দেশের বিভিন্ন স্থানে ওয়াজ মাহফিল ও ইসলামী জলসায় উলামায়ে কেরাম বক্তৃতা করে থাকেন। সেখানে হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়। ঐসব অনুষ্ঠানে যদি ইসলামী অর্থনীতির কল্যাণময় দিক এবং সুদী অর্থনীতির কুফল বিশদভাবে বুঝিয়ে বক্তব্য রাখা যায় তাহলে যে আলোড়ন সৃষ্টি হবে, জনমত গড়ে উঠবে তার আঘাতে সুদী অর্থনীতি উৎখাত হতে পারে, বাস্তবায়িত হতে পারে ইসলামী অর্থনীতি।

তৃতীয়ত : দেওয়াল লিখন ও পোস্টারিং। সুদের অপকার সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তুলতে হলে দেওয়াল লিখন ও পোস্টারিং একটা মোক্ষম উপায়। এর মাধ্যমে সহজেই সুদের ভয়াবহ কুফল ও হালাল রুজির অপরিহার্যতা তুলে ধরা যায়। সুন্দর ডিজাইনে বড় বড়

হরফে ছাপা পোস্টার লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। একইভাবে দেওয়াল লিখনের চমৎকার শ্লোগানগুলো দাগ কেটে বসবে লোকের মনে। পৃথিবীর সকল দেশেই বিশেষতঃ উন্নয়নশীল দেশসমূহে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলো ছাড়াও খোদ সরকারই এই পদ্ধতির আশ্রয় নিচ্ছে। ফলও পাচ্ছে হাতে হাতে। উল্লেখ্য যে, দেয়াল লিখন ও পোস্টার লাগানো দ্বারা যেন কারো কোনো ক্ষতি না হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থেকে অনুমতি নিয়ে নিতে হবে।

চতুর্থত : পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ ও উপসম্পাদকীয় প্রকাশ। দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকায় সুদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিকতাবিধ্বংসী প্রসঙ্গসমূহ নিয়ে পরিকল্পিতভাবে নিয়মিত বিশদ আলোচনা প্রকাশিত হতে থাকলে তা যেমন গণসচেতনতা সৃষ্টি করবে তেমনি গণজাগরণেরও আবহ তৈরি হবে। একই উদ্দেশ্যে সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে, দেশের কর্ণধারদের সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে উপসম্পাদকীয়ও প্রকাশিত হতে পারে। দেশে এখন ইসলামী ভাবধারার কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। সেসব দৈনিক এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসলে তা হবে অতি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

২. <u>আখেরাতে জবাবদিহিতার অনুভূতি জাগ্রত করা :</u> মুসলমানদের জীবনে রয়েছে দু'টি পর্ব– ইহকাল ও পরকাল। পরকালের জীবন অনন্ত। ইহকালের জীবন ক্ষণস্থায়ী, নশ্বর। পরকালের জীবনে রয়েছে অপরিমেয় পুরস্কার অথবা কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আল্লাহ নির্দেশিত পথে ইহকালে জীবন যাপন করলে যেমন আখেরাতে রয়েছে আনন্দময় জীবন, তেমনি সেই নির্দেশের পরিপন্থী জীবন যাপনের জন্য রয়েছে অনন্ত দুঃখভোগ। আল্লাহ নিজেই বলেছেন, 'যারা [আল্লাহ তাআলাকে] অস্বীকার করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে [এদের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত হচ্ছে], এরা সবাই জাহান্নামের অধিবাসী [হবে], সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে, কতো নিকৃষ্ট সে আবাসস্থল!' [সূরা তাগাবুন, আয়াত : ১০]

যেসব কারণে আখেরাতে বনী আদমকে ভয়াবহ পরিণামের সম্মুখীন হতে হবে, তার অন্যতম হলো হারাম পন্থায় উপার্জন ও হারাম বস্তু ভোগ।

রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ঐ দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যা হারাম খাদ্য দ্বারা গঠিত'।

হারাম খাদ্য শুধু হারাম বস্তু হতেই তৈরি হয় না, হারাম উপার্জন হতে সংগৃহীত খাদ্যও হারাম বলেই গণ্য হবে।

সুদ-ঘুষ, চুরি-দুর্নীতি, টেণ্ডারবাজি, জালিয়াতি, ওজনে কম দেওয়া, ভেজাল দেওয়া, নকল করা, জুয়া, ফটকাবাজারী, প্রতারণা প্রভৃতি সবই ইসলামে হারাম। এসব হারাম পন্থায় উপার্জন করা বা বিত্তবান হওয়া যেমন হারাম তেমনি ঐ উপার্জন বা বিত্ত-সম্পদ ভোগ বা ব্যবহার করাও হারাম। পূর্বেই বলা হয়েছে রুজি দোয়া কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত। সুতরাং, বলার অপেক্ষা রাখে না যে, হারাম উপার্জন আখেরাতে আমাদের কোনো কাজে তো আসবেই না, উল্টো এর পরিণাম হবে ভয়াবহ। এজন্যই অন্যান্য সব হারাম উপার্জনের মতো সুদও অবশ্যই বর্জন করতে হবে। সুদ খাওয়ার পাশাপাশি সুদের হিসাব লিখে ও সাক্ষ্য দিয়েও হারাম উপার্জন করা সম্ভব। তাই এই পথও বন্ধ করতে হবে। অর্থাৎ, কোনো প্রকারেই সুদের সাথে কোনোরূপ সংশ্রব রাখা চলবে না। তা না হলে এই আয়ের জন্য, এই আয়ে জীবন ধারণের জন্য আখেরাতে ভয়াবহ ও ভীতিকর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। জনগণের মধ্যে এই চেতনা, এই বোধ জাগিয়ে তোলা অতীব জরুরি।

এ দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলামপ্রীতি ঈর্ষণীয়। কিন্তু এদের বিপুল অংশই ইসলামের মূল দাবি আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকারের অনুসরণের মাধ্যমে যে আল্লাহর বন্দেগী হয়, সে সম্বন্ধে প্রায় অনবহিত বললে অত্যুক্তি হবে না। এমন অজস্র লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে যারা সালাত, সিয়াম, যাকাত ও হজ্জের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই ইসলামকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। অর্থাৎ তাদের বিশ্বাস শুধু এগুলো পালন করলেই একজন মুসলমান হিসাবে আল্লাহর কাছে স্বীকৃত হবে এবং আখেরাতে নাজাত পেয়ে যাবে। আয়-রোজগার, ব্যয়, ভোগ, বিনিয়োগ ইত্যাদি সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ কী সে সম্বন্ধে না তারা জানার চেষ্টা করেছে, না সেসব আমলের ব্যাপারে সতর্ক হয়েছে। তাই এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করাই হলো অত্যাবশ্যক কাজ।

হালাল রুজি উপার্জনের ব্যাপারে, হালাল খাদ্য ও হালাল সামগ্রী ভোগের ব্যাপারে খুলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে

তাবেঈন, এমনকি ইমামগণ কতদূর সতর্ক ছিলেন সে খবর আমরা কতজন রাখি? অথচ সেইসব উদাহরণই হওয়া উচিৎ ছিল আমাদের পালনীয় আদর্শ। বহু লোক আখেরাতকে ভয় করলেও আখেরাতের জবাবদিহিতা সম্পর্কে হয় অনবহিত, নয়তো গাফেল বা অসতর্ক। বর্তমানের প্রয়োজনের অজুহাতে অথবা শয়তানের কৌশলী প্রতারণা বা প্ররোচণার বশীভূত হয়ে তারা দুনিয়া তথা এর সম্পদ ও ভোগবিলাস অর্জনের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করছে। ফলে হালাল-হারামের বাছ-বিচার তার কাছে গৌণ বা তাচ্ছিল্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ভ্রান্তি এতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, সুদের কারবার করে, সুদের লেনদেন করে, সুদী উপার্জনের অর্থেই এই উদ্দেশ্যে হজ্ব করতে যায় যে, হজ্জের কারণে আল্লাহ তার সমুদয় গুনাহ মাফ করে দিবেন! অথচ সহীহ হাদীসের মর্মার্থ এর বিপরীত।

৩. <u>পাঠ্যসূচীতে ইসলামী অর্থনীতি চালু করা</u> : বাংলাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য এই যে, এ দেশের স্কুল-কলেজের শিক্ষার বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাদের ঈমান ও আকীদার কোনো সংশ্রব নেই। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে শিক্ষার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে প্রবর্তিত ইসলামী শিক্ষার কথা বাদ দিলে উচ্চতর শিক্ষা এবং বিশেষ শিক্ষার কোনো পর্যায়েই ইসলাম যে একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা তা জানার কোনো সুযোগই নেই। এই অবস্থার নিরসন হওয়া দরকার। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যসূচীতে দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ঈমান-আকীদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। এজন্য প্রয়োজন গোটা পাঠ্যসূচীর সংস্কার। যারা আগামী দিনে এদেশের প্রশাসন, বিচার, আইন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কল-কারখানার কর্ণধার হবে, তাদের যদি এখনই সুদী অর্থনীতির কুফল ও ধ্বংসাত্মক দিক সম্বন্ধে অবহিত করা না যায় এবং পাশাপাশি ইসলামী অর্থনীতির গঠনমূলক ও হিতকর দিকগুলো জানানো না যায়, তাহলে জাতি যে অন্ধকারে রয়েছে সেই অন্ধকারেই থেকে যাবে।

কিশোর বয়সেই যা শেখা যায়, যে বিষয়গুলো স্কুলের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত থাকে সারা জীবন তার প্রভাব রয়ে যায় মানুষের চিন্তা, চেতনা ও কর্মধারার উপর, কখনো সচেতনভাবে কখনো অবচেতন মনে। সেজন্যই বিভিন্ন

মতাদর্শের স্কুলের পাঠ্যসূচীর বিষয় নির্বাচন করা হয় যথেষ্ট সতর্কতার সাথে, প্রচুর যাচাই-বাছাই ও চিন্তা-ভাবনার পর। সরকার পরিচালিত স্কুল ও কলেজসমূহের পাঠ্যক্রমে জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্য, কল্যাণময় জীবন, সমৃদ্ধ ও নিরাপদ সমাজ গঠনের জন্য যেসব মৌলিক বিষয়ের জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য সেসব বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর স্কুল পাঠ্যসূচী বা যেসব সিলেবাস অনুসরণ করা হয় সেগুলো একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এই সত্য সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে। আমাদের দেশেও বিগত দশকগুলিতে স্কুলের পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। দেশের মুক্তি সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী, বীরশ্রেষ্ঠদের জীবনগাঁথা, বৃক্ষরোপণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল, এমনকি একেবারে সাম্প্রতিক কালে এইডসের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কেও আলোচনা ঠাঁই পেয়েছে স্কুলের পাঠ্যসূচীতে।

অথচ গভীর পরিতাপের বিষয়, ইসলামী জীবনাদর্শ, আচরণ, ইসলামী শিক্ষা, অমর মুসলিম মনীষীদের জীবনকাহিনী এই পাঠ্যসূচীতে ঠাঁই করে নিতে পারেনি। ফলে লক্ষ লক্ষ শিশু, কিশোর-কিশোরীর ইসলামী ভাবধারাপুষ্ট হয়ে গড়ে ওঠার কোনো সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে এদেশের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিকড়হীন জনসমর্থনহীন বাকসর্বস্ব মুষ্টিমেয় এইসব বুদ্ধিজীবীর সুকৌশলী পদক্ষেপ বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচীতে যেন কোনোক্রমেই ইসলামী জীবনাচরণ সম্পর্কে জানার ও শেখার সুযোগ না থাকে সেজন্য এরা প্রায়শই সেক্যুলার পাঠ্যসূচীর যৌক্তিকতা, বিজ্ঞানমনস্ক পাঠ্যসূচীর অপরিহার্যতা ইত্যাকার চটকদার ব্যানারে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম-ওয়ার্কসপের আয়োজন করে গৃহীত সুপারিশসমূহ জাতীয় দাবি শিরোনামে সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলের কাছে পেশ করে। একই সঙ্গে তাদের ঘরানার পত্রিকারগুলোও জোর সমর্থন দিয়ে যায়। ফলে সরকারের নীতি নির্ধারকরাও বিভ্রান্ত বা বিচলিত না হয়ে পারে না।

অথচ দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ঈমান-আকীদার সাথে সম্পর্কিত বিষয় স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা উচিৎ ছিল। ইসলামী জীবনাচরণ, হালাল উপার্জনের অপরিহার্যতা, যাকাতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুফল, সুদের অবশ্যম্ভাবী ক্ষতিকর প্রসঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা খুবই জরুরি।

৪. সামাজিক প্রতিরোধ সৃষ্টি : সুদের মতো ভয়াবহ এক অক্টোপাসের নাগপাশ হতে মুক্তি লাভ করতে প্রয়োজন মজবুত সামাজিক প্রতিরোধ। যথাযথ সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারলে বহু অন্যায়-অপকর্ম ও অসামাজিক কাজ হতে জনগণকে বিরত রাখা যায়। জনগণকে সত্যিকারভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে, সামাজিকভাবে সচেতন করতে পারলে বহু কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায়। এদেশে বনায়ন কর্মসূচী তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ। বছর ত্রিশেক পূর্বে দেশের অনেক এলাকায় মরুকরণের লক্ষণ ফুটে উঠেছিল। সেই সময় বৃক্ষরোপণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে জনমত তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। রেডিও-টেলিভিশন সংবাদপত্র প্রভৃতি গণমাধ্যমে নানান অনুষ্ঠান প্রচার ছাড়াও স্কুল-কলেজ মক্তব-মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীদের এই কাজে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী গৃহীত হয়। একাজের সামাজিক স্বীকৃতি স্বরূপ শহর, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আজ তার সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

সুদ উচ্ছেদের জন্য এ ধরনের জনমত গঠনের পদক্ষেপ নিতে হবে। এক সময় এদেশের সমাজে সুদবিরোধী মনোভাব বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আজ সমাজে সুদখোরদের দাপট চোখে পড়ার মতো। গ্রামাঞ্চলে সুদখোররা মহাজন নামে পরিচিত। সুদী ব্যবসার কারণে সমাজপতিদের মধ্যেও তারা আসন করে নিয়েছে। শহরেও সুদের লেনদেনকারী ব্যবসায়ী-পুঁজিপতিরা সকল কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছে। সুদকে আজ আর ঘৃণার চোখে দেখা হচ্ছে না। এর প্রতিবিধানের চেষ্টা না করলে এই সর্বনাশা পাপ ও সমাজবিধ্বংসী বিষ আরও ভয়াবহ রূপ নিবে। এজন্যেই প্রয়োজন সামাজিক প্রতিরোধ সৃষ্টি। এই প্রতিরোধ যতই ব্যাপক ও দুর্বার হবে সুদের নিস্পেষণ ততই শিথিল হতে বাধ্য। ক্রমে এক সময়ে তা খসে পড়বে। এসব পদক্ষেপের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো-

ক. সুদখোরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা : সমাজে যারা সুদখোর বলে পরিচিত, ধীরে ধীরে তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে। তারা যেন বুঝতে পারে যে, সুদের সঙ্গে সংশ্রব থাকার কারণেই জনগণ তাদের সঙ্গ বর্জন করছে বা তাদের এড়িয়ে চলছে। কাজটা কঠিন মনে হতে পারে কিন্তু সকলে মিলে এগিয়ে এলে মোটেই দুঃসাধ্য নয়।

খ. সুদখোরদের জনপ্রতিনিধি না বানানো : জনপ্রতিনিধিত্বমূলক কোনো কাজে সুদখোরদের নির্বাচিত হতে দেওয়া হবে না। তারা ভোটপ্রার্থী হলে যেন ভোট না দেওয়া হয় সেজন্য জোর প্রচারণা চালাতে হবে। জনগণকে বুঝাতে হবে এইসব লোকের কার্যক্রমের জন্যই সমাজে শোষণ-নির্যাতন-নিপীড়ন জগদ্দল পাথরের মতো চেপে থাকবে।

গ. সুদখোরদের সামাজিকভাবে বয়কট করা : যারা সুদের ব্যবসা করে, গ্রামে মহাজনী কারবারের সাথে যারা যুক্ত তাদের ছেলে-মেয়ের সাথে নিজেদের ছেলে-মেয়ের বিবাহ না দেওয়া এবং তাদের জানাযা না পড়ানোও উত্তম প্রতিষেধকের কাজ হতে পারে। বাংলাদেশেই আজ হতে পঞ্চাশ-ষাট বছর পূর্বে গ্রামাঞ্চলে সুদখোরের দাওয়াত কেউ সহজে গ্রহণ করতে চাইত না। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনীতির দাপটে এবং দীনী শিক্ষা বঞ্চিত হওয়ার কারণে সেই অবস্থার দুঃখজনক পরিবর্তন ঘটেছে।

ঘ. ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা : সরকার যেসব ক্ষেত্রে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা হিসাবে সুদ প্রদান বাধ্যতামূলক করে রেখেছে সেগুলো রহিত করার জন্য ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা যেতে পারে। উদাহরণতঃ জমির খাজনা যথাসময়ে দিতে না পারলে তার ওপর সুদ দিতে হয়। সুদের বদলে সরকার অন্য কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে। ঈমান ও আকীদা বিরোধী সুদ কেন দিতে হবে? অনতিবিলম্বে সরকার যেন খাজনার খাত থেকে সুদ প্রত্যাহার করে নিতান্তই অপরিহার্য ক্ষেত্রে অন্য কোনো পদক্ষেপ নেয়, সে লক্ষ্যে জনমত গঠন করা প্রয়োজন।

উপরে উল্লিখিত কাজগুলো কঠিন নিঃসন্দেহে। কিন্তু মুমিনের জীবনে কোন্ কাজটি সহজ? বরং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ওপর তাওয়াক্কুল করে তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সমবেতভাবে এসব উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে ধীরে ধীরে, পর্যায়ক্রমে।

৫. <u>অনাবশ্যক সামাজিক ব্যয় প্রতিরোধ :</u> সমাজে বসবাস করতে হলে নানান সামাজিক অনুষ্ঠানে যেমন যোগ দিতে হয় তেমনি আয়োজনও করতে হয়। কিন্তু বিপত্তি বাঁধে যখন ঐ সব অনুষ্ঠান আড়ম্বর ও ঐশ্বর্যের প্রদর্শনী হয়ে দাঁড়ায়। উপরন্তু অনেক অনুষ্ঠান ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলে চালু

থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ঐসব অনুষ্ঠানের কোনো ধর্মীয় ভিত্তি নেই। যেমন কেউ মারা গেলে মৃত্যুর চল্লিশ দিনের মাথায় বিরাট আয়োজন করে দশগ্রামের বা মহল্লার লোকজন ডেকে খানাপিনার আয়োজন করা। ছেলের খাৎনা উপলক্ষে বন্ধু-বান্ধব, পড়শী-স্বজন সকলকে ডেকে উৎসবমুখর পরিবেশ ও ভোজের আয়োজন এবং অভ্যাগতদেরকে উপঢৌকন প্রদানে বাধ্য করা। এছাড়াও রয়েছে জন্মদিন, মৃত্যুবার্ষিকী, বিবাহবার্ষিকী প্রভৃতি নানান বিদআতী অনুষ্ঠান। রয়েছে বিচার আচার ও সালিশী বৈঠক। এসব বৈঠকের জন্য যে প্রচুর ব্যয় হয় তা বলাই বাহুল্য। বিয়ে-শাদীর কথা তো না বলাই ভালো। ইসলামের এই অপরিহার্য ও সরল সামাজিক অনুষ্ঠানটিতে বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণে ঢুকে পড়েছে পান-চিনি বা পাত্র দেখা, গায়ে হলুদ এবং রয়েছে ঘৃণ্য যৌতুক প্রথা। সম্প্রতি যৌতুকবিরোধী মনোভাব দানা বেঁধে ওঠার প্রেক্ষিতে একে গিফট বা উপঢৌকনের লেবাস পরানো হয়েছে।

একজন বিত্তশালী ব্যক্তি অক্লেশে এসব অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার বহনে সক্ষম। অনেক ক্ষেত্রে নতুন বিত্তশালী বা হঠাৎ করে ধনী হওয়া লোকেরা সামাজিক পরিচিতি, প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা লাভের জন্য তাদের অর্জিত অর্থ অকাতরে ব্যয় করেন। সমস্যার সৃষ্টি হয় যখন একই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে বলা হয় মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত শ্রেণীর কাউকে। সমাজপতিরা রায় দেন- এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে, এটা নিতে হবে। না হলে সমাজচ্যুত হতে হবে। অথচ এসবের ব্যয়ভার বহনের সাধ্য তার নেই। নিরুপায় হয়ে তখন তাকে সহায়-সম্বল বিক্রি করতে হয় অথবা ঋণ নিতে হয় সুদ দেবার শর্তে। সাধারণতঃ এসব সামাজিক প্রয়োজনে গৃহীত ঋণের সুদের হার বেশ চড়া হয়ে থাকে। কারণ ঋণদাতা ভালো করেই জানে যে, ঋণ গ্রহীতার বিকল্প কোনো উপায় নেই। সামাজিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য বাধ্য হয়ে নেওয়া এই ঋণ অতি অবশ্যই অনুৎপাদনশীল ও অপ্রয়োজনীয় খাতের। ফলে তা পরিশোধ করা হয়ে দাঁড়ায় আরও দুরূহ। তাই ঋণের বোঝা চেপে বসে গ্রহীতার মাথায় জগদ্দল পাথরের মতো। শেষ অবধি তাকে শেষ সম্বল চাষের জমিটুকু, এমনকি ভিটেমাটি পর্যন্ত বেঁচে দিতে হয় ঋণ পরিশোধের জন্য। এই পথে গ্রাম বাংলার হাজার হাজার মাঝারি ও প্রান্তিক কৃষক ভূমিহীন চাষীতে

পরিণত হয়েছে। চাকুরীজীবিদের অনেকের ক্ষেত্রে এই ব্যয় পুষিয়ে নেবার অন্যতম উপায় ঘুষ, যার বোঝা বইতে হয় পরোক্ষভাবে সমাজের সকলকেই। এর প্রতিবিধান ও প্রতিরোধের জন্য চাই ব্যাপক গণসচেতনতা। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন।

উত্তর : জান্নাত কীভাবে পাওয়া যাবে?

উত্তর : জান্নাত লাভের অনেক উপায় আছে। তন্মধ্যে কয়েকটি উপায় হলো–

১. শাহাদাত : জান্নাতে প্রবেশের প্রথম উপায় হলো শাহাদাত অর্থাৎ একথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, যিনি একক, যার কোনো শরীক নেই। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। সুতরাং যে ব্যক্তি ইসলামের এ সাক্ষ্য প্রদান করবে, এর যাবতীয় আরকান পালন করবে, আর এক অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

উবাদাহ্ ইবনে সামেত রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন– "যে ব্যক্তি এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, 'এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো প্রকৃত ইলাহ্ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল, ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁর বান্দা ও রাসূল এবং আল্লাহর কালেমা যাকে তিনি মরিয়ামের নিকট প্রেরণ করেছেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে রূহ, আর জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য'; আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তার আমল যাই হোক না কেন"। [বুখারী ও মুসলিম]

আল্লাহ্ তাআলা বলেন– "নিশ্চয়ই যারা বলে, আমাদের রব আল্লাহ্, তারপর এ কথার ওপর সুদৃঢ় থাকে, তাদের কোনো ভয় ভীতি নেই, তাদের কোনো চিন্তা নেই। তারাই জান্নাতবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এ জান্নাত তারা তাদের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ লাভ করবে। [সূরা আহক্বাফ : ১৩-১৪]

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "জান্নাত পেতে আগ্রহী নয় এমন ব্যক্তি ছাড়া আমার সকল উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কে এমন ব্যক্তি আছে যে জান্নাতে যেতে অস্বীকৃতি জানায়? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে যাবে, আর যে আমার নাফরমানী করবে ও অবাধ্য হবে, সেই জান্নাতে যেতে অস্বীকার করে"। [বুখারী]

<u>২. আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নামসমূহ আত্মস্থ করা :</u> জান্নাতে যাওয়ার আরেকটি উপায় হলো, আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নামসমূহ মুখস্থ করা। যেমন- হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম আছে। যে ব্যক্তি এ নামগুলো আত্মস্থ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"। [বুখারী ও মুসলিম]

<u>৩. পবিত্র কুরআন পাঠ করা এবং কুরআনের নির্দেশনা মোতাবেক আমল করা :</u> পবিত্র কুরআন পাঠ করা এবং তদানুযায়ী আমল করাও জান্নাতে যাওয়ার একটি মাধ্যম। যেমন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "[কেয়ামতের দিন] কুরআন পাঠকারী ও তার আমলকারীকে বলা হবে, ধীরে ধীরে সুন্দর ও সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করো আর মর্যাদার উচ্চশিখরে আরোহণ করো; যেমন দুনিয়াতে পাঠ করতে। কেননা তোমার মর্যাদা হলো কুরআনের শেষ আয়াত পর্যন্ত যা তুমি পাঠ করবে"। [তিরমিযী # আবু দাউদ # ইবনে মাজাহ]

আবু উমামা থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি ফরয নামাজের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে জান্নাতবাসী হবে"। [নাসায়ী, তাবারানী, ইবনে হিব্বান]

হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– '৩০ আয়াত বিশিষ্ট কুরআনের একটি সূরা, এর পাঠকের জন্য জান্নাতে না নেওয়া পর্যন্ত সুপারিশ করতেই থাকবে। সূরাটি হলো তাবারাকাল্লাযী' (তথা সূরা মূলক)। [তাবরানী]

৪. আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করা : আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করলেও বেহেশতে যাওয়ার পথ সুগম হয়। যেমন- হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- যে ব্যক্তি ইলম হাসিলের উদ্দেশ্যে বের হয়, এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন"। [মুসলিম]

৫. আল্লাহ্ তাআলার জিকির করা : আল্লাহ্ তাআলার জিকিরও জান্নাত লাভের অন্যতম মাধ্যম। যেমন হাদীস শরীফে আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- যে ব্যক্তি জিকির করতে করতে জিহ্বা ও ঠোঁট তরতাজা রাখবে কেয়ামাতের দিন সে হাসতে হাসতে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

৬. অজুর পর কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করা : অনুরূপভাবে অজুর পর কালিমায়ে শাহাদাত পাঠও জান্নাতে যাওয়ার উপায়। উকবাহ্ ইবনে আমের রাযি. বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ সুন্দর করে অজু করার পর যদি বলে-

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم

اجعلنى من التوابين و اجعلنى من المتطهرين

তার জন্য জান্নাতের ৮টি দরজাই উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করবে। [মুসলিম]

৭. সকাল বিকাল সায়্যিদুল ইস্তেগফার পাঠ করা : আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাগফেরাত কামনার একটি বিশেষ দোয়াকে সাইয়্যেদুল ইসস্তিগফার বা গুনাহ্ মাফ চাওয়ার প্রধান দোয়া বলে অভিহিত করেছেন এবং জান্নাতে প্রবেশের কারণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন- যে ব্যক্তি বিশ্বাসের সাথে দিনে এ দোয়া পাঠ করে, সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই যদি তার মৃত্যু হয়, তাহলে সে জান্নাতবাসী হবে। আর যে ব্যক্তি বিশ্বাসের সাথে রাতে পাঠ করে এবং সকাল হওয়ার পূর্বেই মারা যায়, সেও জান্নাতবাসী হবে"। [বুখারী]

সুতরাং প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! দোয়াটি মুখস্থ করুন এবং সকাল সন্ধ্যা পাঠ করুন। দোয়াটি হলো–

اللهم انت ربى لااله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك

مااستطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوؤ لك بنعمتك علي و ابوؤ بذنبي

فغفرلي فانه لا يغفر الذنوب الا انت

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমার রব। তুমি ছাড়া আর কোনো সত্য মাবুদ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার বান্দা। আমি তোমার ওয়াদা ও অঙ্গিকারের ওপর সাধ্যানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত। আমি অনিষ্টকর যা কিছু করেছি তা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমার ওপর তোমার যে নেয়ামত আছে তার স্বীকৃতি দিচ্ছি। তোমার নিকট আমার গুনাহের স্বীকৃতি দিচ্ছি। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কেননা তুমি ছাড়া আর কেউ গুনাহ্ ক্ষমা করতে পারে না।

৮. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ গুরুত্ব দিয়ে যথাযথভাবে আদায় করা : নামাজ হলো দীনের খুঁটি। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের ওপর দিন রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরয করেছেন। এই নামাজগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে যথাযথভাবে আদায় করা জান্নাতে লাভের অন্যতম উপায়। যেমন– হযরত ওবাদা ইবনে সামেত রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা বান্দাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি নামাজসমূহের হক আদায়ে কোনো প্রকার কমতি না করে সঠিকভাবে সেগুলো আদায় করে, তার জন্য আল্লাহর এ অঙ্গীকার রয়েছে যে, তিনি তাকে জান্নাত দান করবেন। আর যে ব্যক্তি এগুলোর ব্যাপারে কমতি ও শৈথিল্য করবে, তার প্রতি আল্লাহর কোনো অঙ্গীকার নেই। তিনি চাইলে তাকে শাস্তিও দিতে পারেন, আবার ক্ষমাও করতে পারেন"। [মুয়াত্তা মালিক # মুসনাদে আহমাদ # সুনানে আবু দাউদ # নাসায়ী # ইবনে মাজাহ]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজর ও আসরের দু'ওয়াক্ত নামাজের পৃথক মর্যাদা দিয়ে এগুলোর নাম দিয়েছেন 'বারদাইন' অর্থাৎ দু'টি শীতল ওয়াক্তের নামাজ। আবু মূসা আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত,

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "যে ব্যক্তি শীতল ওয়াক্তের দুই নামাজ [ফজর-আসর] আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"। [বুখারী # মুসলিম]

৯. বেশি বেশি সালাম দেওয়া, গরীব-মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো এবং তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করা : বেশি বেশি সালাম দেওয়া, গরীব-মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো এবং তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করাও বেহেশতে যাওয়ার অন্যতম উপায়। যেমন এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "হে লোকসকল! তোমরা সালামের প্রসার করো। [গরীব-মিসকিনকে] খাবার খাওয়াও এবং লোকজন ঘুমিয়ে গেলে রাতে নফল [তাহাজ্জুদ] নামাজ আদায় করো। তাহলে শান্তির সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে"। [তিরমিযী # ইবনে মাজাহ # আহমাদ]

১০. আযানের জবাব দেওয়া : দিনরাতে পাঁচবার মুয়াযযিনের আযানের জবাব দেওয়া জান্নাতে প্রবেশের আরো একটি কারণ। উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "মুয়াযযিন যখন আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার [২বার] বলে, তখন তার উত্তরে কেউ যদি অনুরূপ বলে; তারপর মুয়াযযিন أشهد أن لا إله إلا الله বললে সে তার মতো أشهد أن لا إله إلا الله বলে; মুয়াযযিন যখন أشهد أن محمدا رسول الله বলে, সেও তাই বলে; তারপর মুয়াযযিন حي على الصلاة বললে সে لا حول ولا قوة إلا بالله বলে এবং حي على الفلاح বললেও সে لا حول ولا قوة إلا بالله বলে; তারপর মুয়াযযিন আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বললে সেও আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বলে। এরপর মুয়াযযিন যখন বলে لا إله إلا الله তখন সেও لا إله إلا الله আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে বললে জান্নাতে প্রবেশ করবে"। [মুসলিম]

১১. হজ্ব করা : ইসলামের পঞ্চম রুকন হলো হজ্ব। হজ্বের প্রতিদান হলো জান্নাত। যেমন, হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "এক ওমরাহ থেকে আরেক

ওমরাহ মধ্যবর্তী সকল গুনাহের জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ। আর পুণ্যময় হজ্বের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়"। [বুখারী # মুসলিম]

১২. করজ দিয়ে তা সচ্ছলতার সাথে আদায় করার সুযোগ দেওয়া : যে সকল মহান কাজ মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করায় তন্মধ্যে একটি হলো, কাউকে ঋণ দিয়ে তাকে তা সচ্ছলতার সাথে আদায় করার সুযোগ করে দেয়া। যেমন, হযরত হুযাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেন, "এক ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর জান্নাতে প্রবেশ করল। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি কী আমল করেছ? সে উত্তরে বলল, আমি মানুষের সাথে কেনাবেচা করতাম। বিপদগ্রস্ত দরিদ্রদেরকে ঋণ পরিশোধের সময় দিতাম এবং কিছু টাকা পয়সা মাফ করে দিতাম। ফলে আল্লাহ তাআলাও আমাকে মাফ করে দিয়েছেন"। [মুসলিম]

এছাড়া আরও যেসকল আমল দ্বারা সহজে জান্নাত লাভ করা যাবে সেগুলো হলো–১. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক কিছু সরিয়ে দেয়া, জন্তু জানোয়ারের প্রতি করুণা করা, উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া, কথা ও কাজে সততা অবলম্বন করা, ক্রোধ সংবরণ করা এবং রাগ না করা, রোগী দেখতে যাওয়া ও রোগীর সেবা করা, মুসলিম ভাইদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করা, বেচাকেনার ক্ষেত্রে উদার হওয়া এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির মানদণ্ডে কথা বলা।

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, "আমি একজন লোককে জান্নাতে এপাশ ওপাশ অর্থাৎ ঘুরাফেরা করতে দেখেছি রাস্তার ওপর থেকে একটি গাছ কেটে ফেলার কারণে যার দরুণ মানুষের চলাফেরায় কষ্ট হতো"। [মুসলিম]

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত অন্য এক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেন– "এক ব্যক্তি একটি কুকুরকে পিপাসায় মাটি চাটতে দেখে। তারপর লোকটি নিজের মোজার সাহায্যে কুকুরটিকে পানি পান করায়। ফলে আল্লাহ তাআলা তাকে প্রতিদান দিলেন এবং জান্নাত দান করলেন"। [বুখারী]

হযরত আবু উমামা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমি জান্নাতের আঙ্গিনায় এমন একটি ঘরের নিশ্চয়তা

প্রদানকারী, যে ঘরটি ঐ ব্যক্তির জন্য হবে, হকদার হওয়া সত্ত্বেও যে ঝগড়া করে না। অনুরূপভাবে আমি জান্নাতের মধ্যস্থলে ঐ ঘরেরও নিশ্চয়তা প্রদানকারী, যে ঘরটি ঐ ব্যক্তির জন্য, যে ঠাট্টা করেও মিথ্যা বলে না। তদুপরি জান্নাতের উপরিভাগের ঐ ঘরেরও আমি জামিনদার, যে ঘরটি হবে উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির জন্য"। [আবু দাউদ]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "নিঃসন্দেহে সততা পুণ্যের দিকে পথ দেখায়। আর পুণ্য জান্নাতের দিশা দেয়। একজন ব্যক্তি সত্য বলতে বলতে সত্যবাদী হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মিথ্যা কথা খারাপ ও গুনাহের দিকে ঠেলে দেয়। আর গুনাহ ও পাপ দোযখের দিকে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে থাকে। এভাবে সে আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদী বলে লিখিত হয়ে যায়"। [বুখারী # মুসলিম]

হযরত আবু দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন– "আমাকে এমন একটি আমল শিক্ষা দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ক্রোধান্বিত হয়ো না, তাহলে জান্নাতে যাবে।" [তাবরানী]

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "যে ব্যক্তি কোনো রোগীকে দেখতে গেল অথবা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো ভাইকে দেখতে গেল, তখন একজন আহবানকারী তাকে ডেকে বলে, তোমার ও তোমার চলার পথ কল্যাণময় হোক, সুন্দর হোক। তুমি জান্নাতে তোমার বাসস্থান করে নিয়েছ"। [ইবনে মাজাহ # তিরমিযী]

হযরত উসমান ইবনে আফফান রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "আল্লাহ তাআলা এমন এক ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যে বেচাকেনায়, বিচার ফয়সালা করায় এবং বিচার চাওয়ায় সরলতা অবলম্বন করেছে"। [আহমাদ # নাসায়ী]

২. জান্নাতের মধ্যে মুসলিম ব্যক্তির সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ও সুন্দর স্থান হলো যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথী

হবে। আর কন্যাদের সঠিক শিক্ষাদান ও লালন পালন করা এবং ইয়াতীমের দায়িত্ব গ্রহণ করা জান্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্য পাওয়া ও তাঁর প্রতিবেশী হওয়ার সুনিশ্চিত কারণ।

আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "যে ব্যক্তি দু'কন্যাকে সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত লালন পালন করে, কিয়ামতের দিন আমি ও সে একত্রে থাকব, এই বলে তিনি তাঁর দু'আঙ্গুলকে একত্র করে দেখালেন। [মুসলিম]

সাহল ইবনে সাদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমি এবং ইয়াতিমের অভিভাবক জান্নাতে এভাবে থাকব"। এ কথা বলে তিনি শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুল দু'টোকে একত্রে মিলিয়ে দু'টোর মধ্যে একটু ফাঁক রাখলেন"। [বুখারী]

৩. পিতামাতা উভয়ের প্রতি অথবা যে কোনো একজনের প্রতি সদ্ব্যবহার করাও জান্নাতে যাওয়ার উপায়। হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি– "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলো মলিন হোক [৩ বার] অর্থাৎ সে ধ্বংস হোক! প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তির? তিনি জবাব দিলেন, "যে ব্যক্তি পিতামাতাকে অথবা তাদের যে কোনো একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল, তারপরও [তাদের খেদমত করে] জান্নাতে যেতে পারল না"। [মুসলিম]

হযরত আবু দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, "পিতা হলো জান্নাতের মধ্যের দরজা। তুমি চাইলে এ দরজার হেফাযত করতে পার অথবা হারাতে পার"। [তিরমিযী # ইবনে মাজাহ]

জনৈক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তার মা আছে কিনা জিজ্ঞেস করল। লোকটি বলল, জী, আমার মা আছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তুমি সার্বক্ষণিক তার দেখাশুনা কর, কেননা তার পায়ের নিকটেই জান্নাত রয়েছে"। [আহমাদ # নাসায়ী # ইবনে মাজাহ]

৪. মানুষের সবচেয়ে বড় কাজ হলো তার জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের হেফাযত করা। সুতরাং যে ব্যক্তি এ দু'টো অঙ্গের হেফাযতের দায়িত্ব নিবে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জান্নাতের ব্যাপারে দায়িত্ব নিবেন।

হযরত সহল ইবনে সাদ রাযি. থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "যে ব্যক্তি তার দুই চোয়ালের মধ্যের বস্তু [জিহবা] এবং দু'পায়ের মধ্যখানের [লজ্জাস্থান] হেফাযতের নিশ্চয়তা দিবে, আমি তার জান্নাতের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেব"। [বুখারী]

৫. সবরের মাধ্যমেও জান্নাত লাভ করা যায়। যেমন, হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমার মুমিন বান্দার নিকট থেকে যখন তার অতি প্রিয়জনের জান কবয করা হয়, আর সে আল্লাহর নিকট সাওয়াবের আশা করে ধৈর্যধারণ করে, তার প্রতিদান আমার নিকট জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়"। [বুখারী]

হযরত আবু মূসা আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যখন কোনো বান্দার সন্তান মারা যায়, তখন আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানের জান কবজ করেছ? তারা বলেন, হ্যাঁ। আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা কি তার কলিজার টুকরার জান কবজ করেছ? তারা বলেন, হ্যাঁ। আল্লাহ তাআলা আবার বলেন, আমার বান্দা [তার কলিজার টুকরা মারা যাওয়ার পর] কী বলেছে? ফেরেশতারা জবাব দেন, সে আল্লাহর প্রশংসা করেছে এবং বলেছে– 'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে'। আল্লাহ তাআলা তখন বলেন, তোমরা আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করো এবং এ ঘরটির নাম দাও 'বায়তুল হাম্‌দ' বা প্রশংসার ঘর"। [তিরমিযী]

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জান্নাত লাভ করার যত আমল আছে সবগুলো পালন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

প্রশ্ন : লজ্জাশীলতা কী?

উত্তর : লজ্জাশীলতা মানব চরিত্রের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ গুণ। যে কাজ করলে জনসমক্ষে মস্তক অবনত হতে পারে ঐ ভয়ে তা পরিহার করা বা তা থেকে বিরত থাকার নাম 'হায়া' বা লজ্জা। অন্য কথায়, লজ্জাশীলতা হচ্ছে– এমন মানবীয় চরিত্র, যা নিকৃষ্ট-কদর্য কথা ও কর্ম পরিহারে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করে এবং যথাযোগ্য হক্বদারকে অবহেলা ও উপেক্ষা করতে বাধা প্রদান করে। অর্থাৎ প্রাপকের প্রাপ্য যথাযথভাবে পৌঁছে দিতে বাধ্য করে।

লজ্জা মানুষকে গর্হিত, অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। ফলে মানুষ উত্তম চরিত্রের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে যার লজ্জা নেই, কোনো কাজ করতে তার বিবেক বাধা দেয় না। মন যা চায় তাই সে করে যায় দ্বিধাহীনচিত্তে। এ কারণে সমাজে সে হয় নিন্দিত, ঘৃণিত।

রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লজ্জাকে ঈমানের অঙ্গ বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন– লজ্জা হলো ঈমানের একটি শাখা। [বুখারী]

হযরত ইমরান ইবনে হুছাইন রাযি. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'লজ্জাশীলতা পুণ্য ও কল্যাণ ব্যতীত আর কিছুই আনয়ন করে না'। অন্য বর্ণনায় আছে, 'লজ্জার সর্বাংশই উত্তম'। [বুখারী # মুসলিম # মিশকাত, হাদীস নং : ৫০৭১]

হযরত আনাস রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নির্লজ্জতা কোনো জিনিসের মধ্যে থাকলে তাকে ত্রুটিপূর্ণ করে। আর লাজুকতা কোনো জিনিসের মধ্যে থাকলে তার শ্রী বৃদ্ধি করে'। [সহীহ আত-তারগীব, হাদীস নং : ২৬৩৫]

লাজুকতা মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণে সহায়ক। লজ্জা থাকলে মানুষ যথেচ্ছ কাজ করতে পারে না। পক্ষান্তরে লজ্জাহীনতা মানুষকে আত্মনিয়ন্ত্রণহীন করে ফেলে। যে কারণে মানুষ ভালো-মন্দ বিচার-বিশ্লেষণ বা যাচাই-বাছাই না করে যে কোনো কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়। হাদীসেও এ কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এ মর্মে নিম্নোক্ত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'পূর্ববর্তী নবীগণের বাণী হতে পরবর্তী লোকেরা

[অবিকৃত অবস্থায়] যা পেয়েছে [এবং যা অদ্যাবধি বিদ্যমান] তা হলো, তুমি যখন বেহায়া তথা নির্লজ্জ হয়ে যাবে তখন তোমার যা ইচ্ছা তাই কর'। [বুখারী # মিশকাত, হাদীস নং : ৫০৭৩]

লাজুকতা এমন একটি অনন্য গুণ, যাকে মহান আল্লাহ ভালোবাসেন। আল-আশাজ্জ আল-আছরী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'নিশ্চয়ই তোমার মধ্যে এমন দু'টি চারিত্রিক গুণ বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা আল্লাহ ভালোবাসেন বা পছন্দ করেন। আমি বললাম, সে দু'টি কী? তিনি বললেন, বুদ্ধিমত্তা ও লজ্জাশীলতা'। [আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং : ৫৮৪]

ইসলামে নিষিদ্ধ বা গর্হিত কাজ বর্জনে, পাপকর্ম থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে লজ্জাশীলতা অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু দীনী ইলম হাছিলে বা শরঈ জ্ঞানার্জনে কিংবা দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল জানার ক্ষেত্রে লজ্জা করা চলবে না। বরং এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিষয় জানতে ও আবশ্যকীয় জ্ঞানার্জনে লজ্জা পরিহার করাই শ্রেয়। সাহাবায়ে কেরাম এ ব্যাপারে কোনো লজ্জা করতেন না। সুতরাং দীনের ব্যাপারে লজ্জা না করে অজানা বিষয় জেনে নিতে হবে।

বস্তুতঃ দীনের উপরে অটল ও অবিচল থেকে ইবাদত-বন্দেগীসহ যাবতীয় আমল সুন্দর ও সুচারুরূপে আদায় করার জন্য লজ্জাশীলতা অতি জরুরি একটি গুণ। এ গুণ মানুষকে যেমন আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে, তেমনি মানুষকে স্বেচ্ছাচারী হতে নিরন্তর বাধা দেয়। তাই এ গুণ অর্জনে আমাদেরকে সচেষ্ট হতে হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

প্রশ্ন : পাক হিন্দে ইসলাম কারা এনেছে? হানাফীরা নাকি গায়রে মুকাল্লিদরা?

উত্তর : আল্লাহ তাআলা মানুষের হিদায়াতের জন্য আম্বিয়ায়ে আলাইহিস সালামের সিলসিলা জারী করেছেন। সর্বপ্রথম নবী ছিলেন আদম আ.। আর সর্বশেষ হলেন নবী সাইয়্যিদুর রাসূল খাতামুন নাবিয়্যীন, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। হযরত আদম

আ. থেকে নিয়ে হযরত ঈসা আ. পর্যন্ত যত শরীয়ত বিশিষ্ট নবী এসেছেন, তাদের উপমা মৌসুমী ফুলের মত। যেমন গরম মৌসুমের ফুলতো গরমকালে খুব সুন্দর দেখা যায়। কিন্তু শীতকাল আসলে তা শুকিয়ে যায়। এরপর ঝরে পড়ে শীতকালের ফুলের জন্য জায়গা খালি করে দেয়। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শরীয়ত ও দীন হল বার মাসি ফুলের মত, যা প্রতিটি মৌসুমে প্রতিটি এলাকায় আর প্রতিটি কালেই তার উজ্জ্বলতা আর রূপ শুধু বাড়েই। আর কিয়ামত পর্যন্ত তা বেড়েই চলবে। এটা এমন ফুল, যা শুকিয়ে যাবে না আর কখনো ঝরেও পড়বে না।

এমনিভাবে আম্বিয়ায়ে কেরাম একেকজন একেক এলাকার নবী ছিলেন। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো নির্দিষ্ট এলাকার নবী ছিলেন না। তিনি হলেন বিশ্বনবী। প্রথম আম্বিয়ায়ে কিরামের উপমা মোমবাতির মত। যা একটি গলি বা একটি এলাকা আলোকিত করতে পারে। কিন্তু সারা দুনিয়াকে কেবল সূর্যই আলোকিত করতে পারে। সুতরাং সূর্য যখন উদিত হয় তখন রাতের মোমবাতির কোনো প্রয়োজন থাকে না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সূর্যের আলোকময় নবুওয়াত আসার পর তাওরাত ও যবুরের আলো অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দীন বিশ্বব্যাপী। আর কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এই জন্যই এতে নতুন উদ্ভুত শাখাগত মাসআলার জন্য ইজতিহাদের সুযোগ রাখা হয়েছে। ইজতিহাদী মাসায়েলের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরআন হাদীস থেকে উদ্ভাবন ও ইজতিহাদের যোগ্যতা রাখেন না, তারা মুজতাহিদদের পথ প্রদর্শন অনুযায়ী কুরআন সুন্নাহ থেকে উদ্ভাবন করা মাসায়েলের ওপর আমল করবে। তাকে বলা হয় মুকাল্লিদ। আর যদি সে ইজতিহাদের যোগ্যও নয়, আবার ইজতিহাদী মাসায়েলে মুজতাহিদের তাকলীদও করে না, তাকে গায়রে মুকাল্লিদ বলা হয়।

নবুওয়তকাল

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুবারক জমানায় শাখাগত মাসআলা সমাধান করার পদ্ধতি ছিল তিনটি। যথা–

১. যে ব্যক্তি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিদমতে উপস্থিত হতে পারতো, তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে উক্ত মাসআলাটি জিজ্ঞেস করে নিতেন।

২. যে সব সাহাবী নবীজী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দূরে থাকতেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ হলেন মুজতাহিদ। তখন তিনি নতুন বিষয়ে ইজতিহাদ করে সমাধান দিয়ে দিতেন।

৩. তিনি যদি মুজতাহিদ না হতেন, তাহলে নিজের এলাকার কোনো মুজতাহিদের তাকলীদ করে নিতেন। যেমন- ইয়ামেনে হযরত মুয়াজ বিন জাবাল রাযি. ইজতিহাদ করতেন। আর বাকি সকল ইয়ামানবাসী তার তাকলীদে শাখসী বা একক ব্যক্তির অনুসরণ করতেন। অথচ ইয়ামানবাসী নিজেরা আরবীভাষী। কিন্তু ইজতিহাদি মাসআলায় মুয়াজ বিন জাবাল রাযি. এর তাকলীদে শখসী করতেন। নবুয়তের জমানায় এমন একজন ব্যক্তির নামও পাওয়া যাবে না, যার ব্যাপারে এটা প্রমাণ করা যাবে যে, তিনি ইজতিহাদের যোগ্য নয় তাই ইজতিহাদ করতেন না, আবার কারো অনুসরণও করতেন না। সে সময় একজনও গায়রে মুকাল্লিদ ছিল না।

সাহাবাদের আমল

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মৃত্যু ইন্তেকাল হয় ১১ হিজরীতে। তখন থেকে সাহাবাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রশ্ন করে সমাধান পাবার পদ্ধতিটি বন্ধ হয়ে যায়। এখনতো আর নবীজীকে প্রশ্ন করার কোনো সুযোগ নেই। তাই এখন শাখাগত মাসআলা সমাধানকল্পে দু'টি পদ্ধতি রয়ে গেল। মুজতাহিদ ইজতিহাদ করবে, আর সাধারণ লোকেরা তাকলীদ তথা মুজতাহিদের অনুসরণ করবে। সুতরাং সাহাবাদের আমলে মক্কা মুকাররমায় হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি., মদীনা মুনাওয়ারায় হযরত যায়েদ বিন সাবিত রাযি., আর কুফায় হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি.-এর 'তাকলীদে শাখসী' বা একক অনুসরণ হচ্ছিল। আর সাহাবাদের হাজারো ফতোয়া দলীল ছাড়া হাদীসের কিতাবে বিদ্যমান আছে। আর সকল লোকেরা দলীল জিজ্ঞেস করা ছাড়াই এসবের ওপর আমল করেছেন। এটাকেই বলে তাকলীদ।

সাহাবীদের আমল, তাবেয়ীদের আমল, তাবে তাবেয়ীদের আমলে একজন ব্যক্তিও ছিল না যে, আহলে সুন্নাত, আবার গায়রে মুকাল্লিদ। কারো ব্যাপারে এটা বলা যাবে না যে, তিনি মুজতাহিদও ছিলেন না, আবার মুকাল্লিদও নন; বরং তিনি গায়রে মুকাল্লিদ ছিলেন। যেমনিভাবে খাইরুল কুরুনে কোনো ব্যক্তি আহলে কুরআন নামে হাদীস অস্বীকারকারী ছিল না। এমনিভাবে কোনো ব্যক্তি আহলে হাদীস নামে ফিক্বহ ও তাকলীদ অস্বীকারকারীও ছিল না।

বিশ্বজনীনতা

যেহেতু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ধর্ম ছিল বিশ্বব্যাপী। এইজন্যই তিনি কায়সার ও কিসরাকে পত্র লিখেন। রোম, সিরিয়া আর ইয়ামান বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। আর তা বাস্তবায়িতও হয়েছে। এমনিভাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ভবিষ্যদ্বাণীও করেছেন যে, এই উম্মত হিন্দ ও সিন্ধেও হামলা করবে। [মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৬৯]

তাইতো ৯২ হিজরীতে মুহাম্মদ বিন কাসেম রহ.-এর নেতৃত্বে ইসলামী বাহিনী সিন্ধুতে হামলা করেছে। আর ৯৫ হিজরী পর্যন্ত সিন্ধু মুসলমানদের কাছে পদানত ছিল। মুহাম্মদ বিন কাসেম এসেছিলেন বসরা থেকে। আর বসরায় তখন ইমাম হাসান বসরী রহ. এর তাকলীদ হত। তারপর যখন ইমাম যুফার রহ. বসরা আসেন তখন সকল লোক হানাফী হয়ে যায়। মোদ্দাকথা এই সিন্ধ বিজয়ীদের মাঝে একজনও গায়রে মুকাল্লিদ ছিল না। আর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাজওয়ায়ে হিন্দের ব্যাপারে বলেছেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে দুই দলকে আল্লাহ তাআলা আগুন থেকে হিফাযত করবেন। এক দল হলো যারা হিন্দে জিহাদ করবে, আর দ্বিতীয় দল হলো যারা ঈসা আ. এর সাথে থাকবে। [মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২২৯ # নাসায়ী শরীফ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬৩]

সুতরাং এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ৩৯২ হিজরীতে সুলতান মাহমুদ গজনবী রহ. হিন্দুস্তান বিজয় করে ইসলামী খিলাফত কায়েম করেন।

এখানে যত মুসলমান হাকীম বংশীয়, যত গোলাম বংশীয় আর যত ঘুরি বংশীয়, আর যত খিলজী বংশীয়, সাদাত বংশীয়, তুঘলোক বংশীয়,

আর সুরী অথবা মোগল বংশীয়, সবাই ছিলেন সুন্নী হানাফী। এই দেশে ইসলাম, কুরআন হাদীস আনয়নের ভাগ্য কেবল হানাফীদেরই ললাটেই আছে। সুতরাং নওয়াব সিদ্দীক হাসান খানও একথা স্বীকার করে লিখেন যে, "যখন থেকে ইসলাম এ এলাকায় আসে, তখন থেকে হিন্দুস্তানের মুসলমানদের সার্বিক অবস্থা হলো এই যে, যেহেতু অধিকাংশ লোক বাদশাহের মত-পথ এবং মাযহাবের অনুসরণকেই পছন্দ করে, এ কারণে সূচনা থেকে এখন পর্যন্ত তারা হানাফী মাযহাবেই প্রতিষ্ঠিত। আর এখানে এই মাযহাবের আলেম এবং ফারেগীনরাই বিচারক, মুফতী ও হাকিম হয়ে থাকে"। [তরজুমানে ওহাবিয়্যাহ : ১০]

সুতরাং একথাটি একটি অকাট্যভাবে ঐতিহাসিক সত্য যে, এই দেশে ইসলাম ইংরেজদের রাজত্বের পূর্বে একজন গায়রে মুকাল্লিদের নামও উপস্থাপন করা যাবে না, যারা ইজতিহাদকে ইবলীশী কাজ আর মুজতাহিদকে মুশরিক বলেছে।

দাতাগঞ্জ বখশ নামে প্রসিদ্ধ সায়্যিদ আলী হাজয়িরী সাহেব রহ. তিনি যেদিন লাহোরে পৌঁছেন, যেদিন হযরত সাইয়্যিদ হুসাইন ঝানঝানবী রহ. এর জানাযা প্রস্তুত করা হয়। তিনি তার নিজের লিখায় লাহোর আগমণের কারণ লিখেন এভাবে যে, "আমি আলী বিন উসমান জালালী। আল্লাহ তাআলা আমাকে কল্যাণ দান করুন। আমি একদা সিরিয়ার দামেস্ক শহরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুয়াজ্জিন হযরত বেলাল রাযি. এর কবরের শিয়রের কাছে ঘুমিয়ে ছিলাম। তখন স্বপ্নে দেখছিলাম যে, আমি মক্কা মুকাররমায় আছি। আর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাবে বনী শাইবা থেকে এক বৃদ্ধ লোককে নিজের কোলে নিয়ে এমনভাবে ভিতরে ঢুকছিলেন, যেমন কোনো বাচ্চাকে মুহাব্বতের সাথে কোলে নেয়া হয়। আমি দৌড়ে নবীজীর খিদমতে উপস্থিত হলাম। আর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাত ও পায়ে চুম্বন করতে লাগলাম। আর আশ্চর্যের সাথে লক্ষ্য করলাম, কোলের লোকটি কে? আর তার এই সৌভাগ্যপূর্ণ অবস্থা কেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আমার ভিতরগত অবস্থা প্রকাশিত হয়ে গেল। তিনি বললেন যে, উনি আবু হানীফা রহ.। যিনি তোমাদেরও ইমাম। আবার তোমাদের রাষ্ট্রের অধিবাসীদেরও ইমাম।

আমার এই স্বপ্নের ব্যাপারে নিজেরও অনেক আশা আছে, সেই সাথে আমার দেশবাসীর জন্যও অনেক আশা-ভরসা নিহিত। তাইতো এই আশা পূর্ণ হয়েছে। এই দেশ হানাফীদের কেন্দ্র হয়েছে। আর আমার এই স্বপ্নের কথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, ইমাম আজম রহ. ঐ সকল হযরতদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত, যারা নিজের চারিত্রিক গুণাবলীর দিক থেকে নবী আদর্শে উৎসর্গিত। আর শরয়ী বিধানের ক্ষেত্রে আলোর মশাল, যারা নববী আলোতে আলোকিত। তাইতো তাকে নিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলছেন। যদি তিনি নিজে নিজে চলতেন, তাহলে তখন তিনি স্বীয় গুণে গুনান্বিত হতেন। আর নিজ গুণে যারা ফয়সালা দেয়, তারা ভুল ফয়সালাও দিতে পারে বা সঠিক ফায়সালাও দিতে পারে। আর যখন তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্বীয় গুণাবলীর কারণে তার গুণাবলী উৎসর্গিত হয়ে গেছে। সুতরাং তার পক্ষে কোনো ভুল ফায়সালা দেবার সুযোগ নেই। শুনে রাখ! এটি একটি বড় রহস্যময় বিষয়”। [কাশফুল মাহযুব : ৮৬]

মোটকথা আপনি ভারতবর্ষের ইসলামী ইতিহাস পড়ুন, সেখানে ইসলামী শক্তির মৌল প্রণোদনা হানাফীদের থেকেই পাবেন।

কোনো হাদীস অস্বীকারকারী অথবা ফিক্বহ অস্বীকারকারী এক ইঞ্চি জমিনও কাফেরদের থেকে ছিনিয়ে এনে ইসলামী হুকুমতে প্রবিষ্ট করায়নি। তাদের যুদ্ধতো কেবল এটাই যে, হানাফীদের ইসলাম সঠিক নয়। তাদের নামাজ সহীহ নয়। আল্লাহ তাআলা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত হানাফীদের উভয় জাহানে কামিয়াবী দান করুন। আমীন।

প্রশ্ন : আলেমদের মাওলানা বলা কি জায়েয? কতিপয় আহলে হাদীস নামের গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুরা বলে থাকেন যে, "মাওলানা এটি আল্লাহর সাথে খাস। যেমন কুরআনে কারীমে এসেছে যে, وارحمنا انت مولانا যেখানে মাওলা বলে আল্লাহ তাআলাকে সম্বোধন করা হয়েছে। সুতরাং কোনো বান্দাকে মাওলানা বলা জায়েজ নয়। এটা সুস্পষ্ট শিরক"। তাদের এই বক্তব্যটি কি সঠিক?

জবাব : গায়রে মুকাল্লিদদের এই বক্তব্যটি বিশুদ্ধ নয়। আলেমদের মাওলানা বলা জায়েয। কেননা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে মাওলানা বলে সম্বোধন করেছেন। যেমন– সূরায়ে নাহলের ৭৬ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা গোলামের মনীবকে তার মাওলা বলেছেন–

সে তার মনীবের ওপর বোঝা। [সূরা নাহল : ৭৬]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত যায়েদ বিন হারেসা রাযি.কে বলেছেন– "তুমি আমার ভাই এবং মাওলা।" [বুখারী শরীফ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫২৮]

ইমাম হাসান রহ.কে মানুষ মাওলা হাসান বসরী রহ. ডাকত। [তাহযীবুত তাহযীব, খণ্ড :২, পৃষ্ঠা : ২৬৩ # আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ২৬৬ # সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫৭৩]

সুতরাং বোঝা গেল, আলেমদের সম্মান করে মাওলানা বলা কোনো দোষণীয় নয়। এটাকে শিরক বলা সম্পূর্ণ বাড়াবাড়ি।

প্রশ্ন : মক্কা মদীনা কেন কটুক্তির কবলে?

উত্তর : কাবা ঘর সমগ্র বিশ্বের জন্য হেদায়েতের কেন্দ্র। যা পবিত্র মক্কা নগরীতে অবস্থিত। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওযা শরীফ বিশ্ববাসীর জন্য রহমত ও বরকত স্বরূপ, যা মদীনা শরীফে অবস্থিত। আল্লাহর ঘর পবিত্র কাবা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওজার কারণে পবিত্র ভূমিদ্বয় মুসলমানদের প্রাণকেন্দ্র। এ পবিত্র স্থান দু'টি সম্পর্কে কিছু বলা মূলত আল্লাহর ঘর ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওজা শরীফকে বলা। এই দুই নগরীর ভালোবাসা মুসলমানদের হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত আছে এবং থাকবে।

কিন্তু অতি দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, ৯০% মুসলমানের দেশ– বাংলাদেশে মুসলমান সরকার থাকা অবস্থায় কিছু কুলাঙ্গার ইসলাম ও মুসলমানদের প্রাণকেন্দ্র মক্কা-মদীনা সম্পর্কে কটুক্তি করার দুঃসাহস দেখিয়েছে। গত ৯ই মার্চ '১২ইং রোজ সোমবার লাকসাম পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজী শিক্ষক কৃষ্ণচন্দ্র সরকার মক্কা মদীনাকে শয়তানের আড্ডাখানা, সৌদিআরবকে শয়তানের দেশ বলে আখ্যায়িত করে। এ সময় সে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং কুরআন শরীফকে নিয়েও বিরূপ মন্তব্য করে। [আমার দেশ, ২২মার্চ-১২ইং]

কটুক্তির অসারতা ও বাস্তবতা : এ অভিশপ্ত হিন্দু এমন পবিত্র ভূমিদ্বয় নিয়ে কটুক্তি করেছে, যার মধ্যে মক্কা হলো– কাবা ঘর, মসজিদে হারাম, যমযম কূপ, মিনা, আরাফা ও মুযদালিফাসহ আরো বহু ঐতিহাসিক ইসলামী নিদর্শনাবলী সমৃদ্ধ নগরী। আর মদীনা হলো– রওযায়ে আতহার এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্মৃতি বিজড়িত পুণ্যভূমি।

এ পবিত্র স্থানদ্বয়ের বৈশিষ্ট্য হলো, সেখানে পাপের ইচ্ছা করাটাই পাপ। তথায় পাপ করার শাস্তিও অন্যান্য স্থানের তুলনায় বেশি। আল্লাহ তাআলা হারাম শরীফকে এমন নিরাপত্তার স্থান বানিয়েছেন যে, সেখানে অপরাধী অপরাধ করে ঢুকে পড়লেও নিরাপদ হয়ে যায়। আর কোনো অপরাধীকে গ্রেফতার বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় প্রবেশ করাও সেথায় নিষিদ্ধ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের কারো জন্য মক্কায় অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করা বৈধ হবে না। [মুসলিম, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৩৯]

এখানে মানুষরূপী শয়তানের দোসর, কাফের মুশরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। এমনিভাবে শয়তানের বড় দোসর দাজ্জাল, ইয়াজুজ মাজুজসহ কিয়ামতের পূর্বে সৃষ্ট সকল ফেতনা ফাসাদ হতে ভূমিদ্বয় সংরক্ষিত থাকবে। যেমন, প্রসিদ্ধ হাদীসে আছে–

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মক্কা মদীনা ছাড়া এমন কোনো শহর নেই যেখানে দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না। আর মক্কা মদীনা প্রত্যেকটির প্রবেশ পথে ফেরেস্তাগণ সারিবদ্ধভাবে পাহারারত আছে। [মেশকাত, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৪০]

তিনি আরও বলেছেন– মদীনা [কুফর নেফাকের] পঙ্কিলতা এমনভাবে দূরীভূত করে যেমন আগুন রূপাকে খাদমুক্ত করে। [মুসলিম, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৪৫]

অন্য বর্ণনায় আছে, মদীনা তার অধিবাসীদের নিয়ে তিনটি ঝাঁকুনি দিবে। ফলে কাফের ও মুনাফিকরা বেরিয়ে পড়বে। [মেশকাত, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৪০]

এতে প্রমাণিত হয় যে, ফেরেশ্তাগণ এই দুই শহরের দ্বারে পাহারারত, দাজ্জাল আসতে চাইলে তরবারী হাতে তাকে বিতাড়িত করা হবে। এমনিভাবে অন্যান্য ফেৎনাও। যে শহর দু'টি এত পূত পবিত্র তার সম্পর্কে একজন হিন্দুর কতবড় স্পর্ধা যে, সে এসব নিয়ে কটুক্তি করলো!

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির দেশ। এদেশে চিন্তা চেতনা ও মতামত প্রকাশের বাকস্বাধীনতা সুশীল সমাজ ও সভ্য জীবনের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। এসব স্বাধীনতা ব্যক্তির সহজাত অধিকার। ইসলামে এসব অধিকারের রয়েছে সর্বোচ্চ স্বীকৃতি। কিন্তু মত প্রকাশের অর্থ অন্য ধর্ম ও ধর্মীয় বিষয়াবলীর প্রতি অসম্মান নয়। এসব অপতৎপরতা ইসলামী আইন ছাড়াও বাংলাদেশের আইনী ধারায় ইচ্ছাকৃতভাবে কথা, লেখা ও আচরণের মাধ্যমে কাউকে আহত করলে বা আহত করার চেষ্টা করলে সর্বোচ্চ ২ বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয়দণ্ড প্রদানের বিধান রয়েছে।

বাস্তবতা : একদিকে কুলাঙ্গারারা মক্কা মদীনা নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করছে। অপর দিকে আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্য থেকে আরো বড় ব্যক্তিত্বদের মুখ দিয়ে এ পবিত্র ভূমিদ্বয়ের স্তুতি ও প্রশংসা প্রকাশ করে যাচ্ছেন।

তাদেরই একজন হলেন 'নাসা'র নভোচারী ভারত বংশোদ্ভুত মার্কিন নাগরিক সুনিতা উইলিয়াম। তিনি মহাকাশ অভিযানে গিয়েছিলেন। তাদের মহাকাশ গবেষণা যানটি যখন পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ২৪০ মাইল উপরে, হঠাৎ নিচের দিকে চোখ আটকে যায় সুনিতার। পৃথিবী পৃষ্ঠে তারার মতো দু'টি আলো জ্বলতে দেখলেন তিনি। চিন্তায় পড়ে গেলেন সুনিতা। ভাবলেন, পৃথিবীপৃষ্ঠে তো এভাবে জ্বলে থাকার মতো কোনো আলোকশিখা থাকার কথা নয়। তবে এই আলোকরশ্মি দু'টি কি?

সঙ্গীদের ডেকে দেখালেন এবং টেলিস্কোপের সাহায্যে আলো দু'টিকে নির্ণয় করার চেষ্টা চালালেন। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো সুনিতার। আরো কাছে, আরো পরিষ্কারভাবে দেখলেন, আলো দু'টির

কেন্দ্রস্থল পৃথিবীর মক্কা ও মদিনা। মক্কা ও মদিনা শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে মহাকাশমুখি এই আলোকরশ্মি দু'টি বিকরিত হচ্ছে।

মহাকাশ অঙ্গনে ঘটে যাওয়া এই ঘটনা সম্পর্কে সুনিতা উইলিয়াম নিজেই বলেছেন, 'আমি যখন পৃথিবী থেকে প্রায় ২৪০ মাইল উপরে উঠলাম, তখন পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে পৃথিবীপৃষ্ঠে দু'টি তারা [আলো] দেখতে পেলাম। এরপর একটি টেলিস্কোপের মাধ্যমে আলো দু'টি দেখার চেষ্টা করলে দেখি, একটি আলোর অবস্থান মক্কায় আর অন্যটি মদিনায়। এই দৃশ্য দেখার পর আমি প্রচণ্ডভাবে অভিভূত হই এবং তখনই ইসলাম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিই। পরে ফিরে এসে ইসলাম গ্রহণ করি। আমি এখন একজন মুসলমান।'

এ মার্কিন নাগরিক সুনিতা সম্পর্কে যাদের জানা ছিল, তাদের বক্তব্য ছিল, আর কারো পক্ষে ইসলাম গ্রহণ সম্ভব হলেও তার পক্ষে ইসলাম গ্রহণ সম্ভব নয়। কেননা সে ছিল কট্টর ইসলাম বিদ্বেষী। [সূত্র : ইসলামিক নিউজ-বিডি]

ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষীদের অবস্থা হলো চামচিকার মতো। সূর্যের কিরণ তার সহ্য না হওয়ায় সে তা নিভাতে উপরের দিকে উঠে। কিন্তু এক সময় সেই আলোতে নিজেই ভস্ম হয়ে যায়। তাই ইসলাম বিদ্বেষীদের বলব, খড়কুটা উড়ে যাবে বলে কী প্রলয় আসবে না। নিশ্চয় আসবে, আপন শক্তিতে, আপন গতিতে। আল্লাহ তাআলা আমাদের পবিত্র মক্কা ও মদীনা নগরীর সম্মান বজায় রাখার তাওফীক দান করুন। আমীন।

প্রশ্ন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি হযরত খাদিজা রাযি.-কে সম্পদের লোভে বিবাহ করেছিলেন?

উত্তর : ইসলাম বিদ্বেষীদের কেউ কেউ বলে থাকেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাকি হযরত খাদিজা রাযি.-কে সম্পদের লোভে বিবাহ করেছিলেন। এর উত্তরে শুরুতেই আমি একটি প্রশ্ন করব। প্রশ্নটি হলো—

ধরুন, আপনি বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী বিল গেটসের মেয়েকে বিয়ে করতে চান। উদ্দেশ্য, তার সম্পত্তির কিছু অংশ হলেও দখল করা।

এখন বলুন তো, এমতাবস্থায় আপনি কি বিল গেট্‌সকে তার মেয়ে বিয়ের ব্যাপারে প্রস্তাব দেবেন, না বিল গেটস স্বয়ং আপনাকে প্রস্তাব দেবে?

এবার সবচেয়ে বেকুব টাইপের নাস্তিকের মাথায়ও বাস্তবতা ধরা দেবে। এই বাস্তবতাটুকু মাথায় রেখে এখন বলুন তো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি হযরত খাদিজা রাযি.-কে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, না খাদিজা রাযি.-ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন?

আচ্ছা, প্রশ্নকারী নাস্তিকদের সুবিধার জন্য ধরে নিলাম, বিল গেট্‌সই আপনাকে বিয়ের প্রস্তাব দিল! এবার আপনি কী করবেন? হ্যাঁ, যদি আপনি অর্থলোভী হয়ে থাকেন, তাহলে তো কোনো দিকে না তাকিয়ে 'কবুল' বলে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। আর যদি লোভী না হন (আল্লাহ যেন এমনটিই করেন!) তাহলে সবদিক বিবেচনা করে বিয়ে করা যাবে কিনা তা নিয়ে কারো সাথে পরামর্শ করবেন।

এবার দেখুন, সরদারে দু'আলম, রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী করেছেন? প্রস্তাব পাবার সাথে সাথেই তিনি কি রাজী হয়ে গেছেন, না কারো সাথে পরামর্শ করেছেন?

এই ঘটনা জানার পরও যদি মনে হয় তিনি অর্থলোভী ছিলেন, তো নাস্তিকদের জন্য আরো কিছু তথ্য দেয়া যেতে পারে।

একজন অভাবীকে যদি এক কোটি টাকা, সাথে রাজকন্যা ও রাজত্ব দেয় হয়, আর সে এসব ফিরিয়ে দেয়, তো সেই অভাবীকে আপনি কী সম্পদলোভী বলবেন?

কাফের সরদার আবু জেহেল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে বিশাল এক লোভনীয় প্রস্তাব নিয়ে এল। প্রস্তাবটা ছিল, আরবের সবচেয়ে রূপবতী নারী তাকে দেয়া হবে, তাকে বানানো হবে সর্দার; সাথে আছে পাহাড়সম ধন-দৌলত! বিনিময়ে তাকে ইসলাম প্রচার বন্ধ করতে হবে।

ক্ষমতালোভী, অর্থলোভী, নারীলোভী হলে আপনি-আমি কী করতাম? ইতিহাস খুলুন, দেখুন মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী করেছেন? তিনি কী বলেছেন? তিনি বলেছেন– আমার এক হাতে চাঁদ এবং আরেক হাতে সূর্য এনে দিলেও আমি সত্য প্রচারে পিছপা হবো না।

এরপরও যদি নাস্তিকরা বুঝে, তিনি অর্থলোভী, নারীলোভী আর ক্ষমতালোভী, তাহলে মনে হয়, তাদের এই গলগণ্ড রোগ বাল্যকালের আয়োডিন স্বল্পতার কারণে কোনোদিনই সেরে উঠবে না!

বিষয়টি আরো পরিস্কার করে বুঝুন, ধরুন আমার টাকা নেই। ঘর ভাঙ্গা, দড়ির বিছানায় শুয়ে ঘুমাই, ঘরের কোণায় একটা পানির কলসি ছাড়া কিছু দেখা যায় না। আমি যদি সম্পদলোভী হই এবং কেউ যদি আমাকে কিছু দিতে চায়, তাহলে আমি কী করব?

হযরত আবু বকর রাযি. হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ঘরে প্রবেশ করে কেঁদে ফেলেন। কারণ, দড়ির বিছানায় শোয়ার কারণে সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের শরীর মুবারকে দাগ পড়ে গেছে। আবু বকর রাযি. বলেন, হুজুর আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি একটা তোষক বানিয়ে দেই।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন, আবু বকর! আমি যদি চাইতাম তো ঐ উহুদ পাহাড় আমার জন্য স্বর্ণে পরিণত হোক, তাই হত। কিন্তু জেনে রেখো, দুনিয়াতে আমি ভোগ-বিলাসের জন্য আসিনি।

এইসব ঘটনার পরও কি কারো মনে হতে পারে, তিনি লোভী ছিলেন? আল্লাহ তাআল আমাদেরকে সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন।

প্রশ্ন : ইবাদতে ইস্তিকামাত বা দৃঢ়চিত্ততা কীভাবে অর্জন হবে?

উত্তর : ইস্তিকামাত তথা দৃঢ়চিত্ততা বা মানসিক অবিচলতার সাথে ইবাদত সম্পন্ন করতে চাইলে নিম্নোক্ত শর্তগুলো পূরণ করা জরুরি–

১. ইবাদত হতে হবে কেবল আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে।

২. ইল্‌ম হবে ইবাদতের ভিত্তি। অর্থাৎ জেনে ও বুঝে কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। কারণ জ্ঞানের ভিত্তিতে সম্পাদিত কর্ম মানুষকে মানসিক নিশ্চয়তা প্রদান করে।

৩. নির্ধারিত পদ্ধতি মেনেই ইবাদত সম্পন্ন করা। নিজের খেয়াল-খুশিমত করলে চলবে না।

৪. চূড়ান্ত পরিণতি তথা আখিরাতে বিচার দিবসের কথা ভেবে সদা সতর্ক থাকা।

৫. এরূপ অঙ্গীকার করা যে, আমি যথাসম্ভব সঠিক ও উত্তমভাবে ইবাদত করব।

৬. উক্ত অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

৭. নিয়মিত নিজ ইবাদতের মুরাকাবাহ্ তথা পর্যালোচনা করা।

৮. মুহাসাবাহ্ তথা নিজের কাছে নিজেই জবাবদিহি করা। অর্থাৎ কোনো ইবাদত শেষ হওয়ার পর ভুল-ত্রুটি যাচাই করে দেখা। তারপর যেটুকু সাফল্য পাওয়া গেছে তাতে সন্তুষ্ট না থেকে আরো ভালো করা যেত কিনা সেটা খতিয়ে দেখা।

৯. ইবাদত সম্পন্ন হওয়ার পর নিখুঁতভাবে করতে না পারার জন্য নিজেকে দোষারোপ করা।

১০. ইবাদতের উন্নতির জন্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

প্রশ্ন : প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যাপারে আমাদের আক্বীদা-বিশ্বাস কেমন হবে?

নবীজির প্রতি আমাদের আক্বীদা বিশ্বাস এমন হবে যে- তিনি সকল সৃষ্টিজীব থেকে শ্রেষ্ঠ । তিনি শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তিনি আখেরী নবী। তাঁর পর দুনিয়াবাসীর প্রয়োজনে আর কোনো নবী-রাসূলের আগমন হবে না। তাঁর দ্বারাই নবুয়তের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। এর পর কেউ নিজেকে নবী বলে দাবী করলে সে হবে কাফের, মুরতাদ ও দাজ্জালের সহচর এবং ইহুদী-খ্রিস্টানদের দালাল।

তিনি নিস্পাপ। তিনি মানুষ ছিলেন। তবে তিনি আমাদের মত সাধারণ মানুষ নন। তিনি অসাধারণ মানুষ। তাঁর সমতুল্য সমকক্ষ কেউ নেই। তাঁর জ্ঞান মর্যাদার সাথে কারো তুলনা করা যায় না। এমনকি পূর্বেকার কোনো নবী করীম-রাসূলদের সাথেও তাঁর তুলনা হয় না। তিনি অতুলনীয়। তিনি মানুষ আকৃতিতে প্রেরিত হলেও আমাদের মত সাধারণ মানুষের সাথে তাঁর ৫৩টি পার্থক্য রয়েছে।

তাঁর পূর্ণাঙ্গ অনুকরণ-অনুসরণ করা ওয়াজিব। তাঁর মেরাজ সত্য। তিনি স্ব-শরীরে জাগ্রত অবস্থায় মিরাজে গিয়েছেন। মিরাজে তিনি স্ব-চোখে আল্লাহ্ তাআলার দীদার লাভ করেছেন।

গায়েবের এলেম আল্লাহ্ তাআলা ছাড়া আর কেউ জানে না। নবীজীও জানেন না। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে যতটুকু গায়িব-এর এলেম শিক্ষা দিয়েছেন তাই তিনি জানেন। এর বেশি নয়। যেমন- বেহেশত, দোজখ, হাশর, কবর ও কেয়ামতের আলামত ইত্যাদি সম্পর্কিত ভবিষ্যৎ বাণী।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রওজা মোবারকে স্ব-শরীরে জীবিত আছেন। তবে কেমন বা কি অবস্থায় আছেন আল্লাহ্ তাআলাই ভালো জানেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামতের ময়দানে তাঁর উম্মতের জন্য শাফায়াত করবেন একমাত্র পূর্ণাঙ্গ তাওহীদবাদী, কুফর-শিরক মুক্ত মুমীনদের জন্য এবং আল্লাহ্ তাআলাও তার সুপারিশ গ্রহণ করবেন। কিন্তু বেদআতীগণ তার সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে।

এ মর্মে দীনের মধ্যে নতুন কোনো প্রথা যেমন জশনে জুলুস-এর মত অনুষ্ঠান, ঈদে মিলাদুন্নবী, ওরসন্নবী ইত্যাদি অনুষ্ঠান ইবাদতের অংশ হিসাবে উদযাপন করা বেদআত।

সমস্ত নবী-রাসূলসহ আমাদর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসূম (অর্থাৎ ছোট কিংবা বড় সব গুনাহ্ থেকে মুক্ত)

কেয়ামতের কঠিন দিবসে তিনি তাঁর তাওহীদবাদী উম্মতকে হাউজে-কাউছারের পানি পান করাবেন।

প্রশ্ন : প্রচলিত মিলাদ, কিয়ামের পদ্ধতি জায়েয কি না?

জবাব : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসা ও গভীর মহব্বত রাখা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্মলগ্ন থেকে ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত তার পবিত্র জীবনাদর্শ ও কর্ম-কাণ্ডের আলোচনা এবং পূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণ আল্লাহ তাআলার রহমত প্রাপ্তির বড় মাধ্যম এবং গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতও বটে। তবে

উক্ত ইবাদত অবশ্যই সে পদ্ধতিতে করতে হবে, যে পদ্ধতি স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরামকে শিক্ষা দিয়েছেন। তারপর সাহাবায়ে কেরাম রাযি. তাবেঈনদের শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাবেঈনগণ পরবর্তীদের শিখিয়ে গেছেন। সে পদ্ধতি হচ্ছে, দিন-ক্ষণ ও সময় নির্ধারণ এবং আনুষ্ঠানিকতা ব্যতিরেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনী আলোচনা এবং দুরূদ শরীফ পাঠ করা। মনগড়া বা ভিত্তিহীন কোনো তরীকায় করলে তা ইবাদত বলে গণ্য হবে না। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করা সওয়াব ও বরকতের বিষয় হলেও শরীয়তের নিয়ম-নীতি সম্পর্কে অজ্ঞ কিছু কিছু লোক 'মীলাদ শরীফ' নামে সম্মিলিত সুরে গদবাধা কিছু পাঠের অনুষ্ঠান এবং কিয়ামের যে রীতি চালু করেছে, তার কোনো ভিত্তি কুরআন-হাদীসে, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনের সোনালী যুগে পাওয়া যায় না। অথচ সর্বজন স্বীকৃত সত্য হলো, তাঁরাই ছিলেন প্রকৃত নবীপ্রেমী খাঁটি আশেকে রাসূল এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শের পরিপূর্ণ অনুসারী ও বাস্তব নমুনা।

প্রচলিত এই মিলাদ ও কিয়ামের উদ্ভব ঘটে ৬০৪ হিজরী সনে। ইরাকের মাসূল শহরের বাদশাহ আবু সাঈদ মুজাফ্ফর কাকরী এবং তার দরবারী আলেম আবু খাত্তাব উমর ইবনে দিহইয়া– এ দু'জন মিলে এর প্রচলন ঘটায়। এরা উভয়ে দীনের ব্যাপারে খুবই উদাসীন এবং ফাসিক প্রকৃতির লোক ছিল। পরবর্তীতে অজ্ঞতা, মূর্খতা ও জাহালতের অন্ধকারে নিমজ্জিত শ্রেণীর লোকদের মাধ্যমে আরো অনেক কুসংস্কার, শরীয়ত বিরোধী বিশ্বাস ও কার্যাবলী এতে সংযোজিত হতে থাকে। যার সবকিছুই কুরআন-হাদীস, ইজমা-কিয়াস তথা শরীয়তের মূল প্রমাণ পরিপন্থী। তাছাড়া মিলাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাজির-নাজির মনে করে কিয়াম করা তো রীতিমতো শিরক। হাজির-নাজির মনে না করলেও শরীয়তে এর ভিত্তি নেই।

এ সকল কারণে প্রচলিত মিলাদ, কিয়াম না জায়েয ও বিদআতের অন্তর্ভুক্ত বলেই সকল হক্কানী ওলামায়ে কেরাম একবাক্যে ফতওয়া দিয়ে থাকেন। এজন্য প্রচলিত মীলাদের আয়োজন না করে 'বিশেষ দোয়া' করা যেতে পারে। এতে দোয়া কবুলের উদ্দেশ্যে নিয়মানুযায়ী কিছুক্ষণ দরূদ

শরিফ, তাসবীহ-তাহলীল, ওজীফা, সূরা ফাতেহা, সূরা ইখলাস ইত্যাদি যার যা জানা আছে প্রত্যেকে নিজস্বভাবে পড়বে। সম্মিলিত সুরে নয়। এরপর মুনাজাত করবে। এ পদ্ধতিতে আমল করার অবকাশ রয়েছে। এটি সর্বোতভাবে শরীয়তসম্মত। এ সম্পর্কে কোনো বিতর্ক বা কারো দ্বিমত নেই। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাজির-নাজির মনে করে ইয়া নবী সালামু আলাইকা বলে দরূদ শরীফ পাঠ করলে তা শিরক হবে। তবে যদি এই বিশ্বাস নিয়ে পাঠ করে যে, এটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে পৌঁছানো হয়, তাহলে শিরক হবে না।

প্রশ্ন : ডেসটিনি বা এজাতীয় মাল্টিলেভেল মার্কেটিং পদ্ধতির কোনো কোম্পানীতে জড়িত হওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন ?

জবাব : বর্তমানে প্রচলিত মাল্টিলেভেল মার্কেটিং পদ্ধতিতে শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ অনেকগুলো বিষয় যেমন জুয়া, ধোঁকা ইত্যাদি বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং ডেসটিনি বা মাল্টিলেভেল মার্কেটিং (এমএলএম) পদ্ধতির কোনো কোম্পানি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কোনোভাবে জড়িত হওয়া বা সহযোগিতা করা বৈধ হবে না। [বুহুস ২/২৩২, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১৬/৮৮]

প্রশ্ন : ইহ ও পরকালে আল্লাহ তাআলাকে দেখা যাবে কি?

জবাব : দুনিয়াতে চর্মচোখে জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহ তাআলাকে দেখা সম্ভব নয়। তবে জান্নাতে প্রত্যেক জান্নাতী স্বচক্ষে আল্লাহ তাআলাকে দেখতে পাবে। অবশ্য স্বপ্নযোগে আল্লাহ তাআলাকে দেখা সম্ভব। যেমন ইমাম আবু হানীফা রহ. আল্লাহ তাআলাকে একশতবার স্বপ্নে দেখেছেন। এক্ষেত্রে কোনো আকৃতি দৃষ্টিতে আসলে সেটাকে আল্লাহ তাআলার প্রকৃত আকৃতি মনে করা যাবে না। বরং সর্বাবস্থায়ই এই আকীদা রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা যে কোনো অবস্থা ও আকৃতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। [কানযুল উম্মাল ১/১২৬, মেরকাত ৯/২৫]

প্রশ্ন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাতামুন্নাবিয়্যীন বা সর্বশেষ নবী– দলীল কি?

উত্তর : পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন–

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

মুহাম্মদ তোমাদের কোনো ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং খাতামুন নবী। আল্লাহ্ সব বিষয়ে জ্ঞাত। [সূরা আহযাব : ৪০]

এই আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খাতামুন নবী বলা হয়েছে। নবী মানে তো আমরা সবাই বুঝি। তাই এখন আমাদের বুঝতে হবে 'খাতাম' শব্দের অর্থ কি?

অভিধানে আমরা দেখি যে, 'খাতাম' শব্দের অর্থ মৌলিকভাবে দু'টি। যথা- ১. মোহর। ২. সর্বশেষ।

এখন প্রশ্ন হলো কুরআনে বর্ণিত খাতাম দ্বারা উদ্দেশ্য কি? মোহর না সর্বশেষ?

যদি খাতাম শব্দের অর্থ মোহর ধরা হয়, তাহলে এ আয়াত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শেষ নবী হওয়ার দলীল হতে পারে না। কারণ তখন 'মোহারাংকিত নবী' মানে দ্বারায়, অন্য নবীদের যেমন বিভিন্ন চিহ্ন ছিল, যেমন মুসা আ. এর নবুওতীর চিহ্ন হলো হাত শুভ্র হওয়া, লাঠি সাপ হওয়া; ঈসা আ.-এর চিহ্ন হলো মৃত মানুষকে জীবিত করা ইত্যাদি; তেমনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবী হওয়ার দলীল হলো তাঁর পৃষ্ঠদেশে নবুওয়তী মোহর থাকা। তখন "খাতাম" বলার দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবী হওয়া প্রমাণিত হয়, কিন্তু শেষ নবী হওয়া প্রমাণিত হয় না। এ ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করেছেন মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী।

পক্ষান্তরে 'খাতাম' শব্দের অর্থ যদি 'সর্বশেষ' ধরা হয়, তাহলে এ আয়াত স্পষ্টভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শেষনবী হওয়ার দলীল হয়।

যেহেতু এ আয়াত দুই অর্থের কোনো অর্থকেই স্পষ্ট ভাষায় বলেনি তাই আমাদের এর ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে।

ব্যাখ্যা খোঁজার সূরত দুইটি। একটি হলো ইচ্ছেমত একটি ব্যাখ্যাকে ধরে নেয়া; মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মত। আরেকটি হলো, আয়াত যার ওপর নাযিল হয়েছে, তার ব্যাখ্যা গ্রহণ করা।

আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এর ব্যাখ্যা সাহাবীদের মাধ্যমে পেয়েছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لاَ نَبِيَّ بَعْدِى

আর আমি শেষ নবী। আমার পর আর কোনো নবী আসবে না। [সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং : ৪২৫৪, সুনানে তিরমিযী , হাদীস নং : ২২১৯, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং : ২২৩৯৫]

তাহলে কী দাঁড়াল? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'খাতাম' শব্দের ব্যাখ্যা করলেন, তারপর আর কোনো নবী আসবে না তথা সর্বশেষ বলে। আর মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী করেছে নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা।

কার ব্যাখ্যা নিবেন? নবীজীর নাকি কাদিয়ানীর?

আমরা বলি, যার মুখ নড়ার দ্বারা কুরআন কুরআন হলো ব্যাখ্যা তারই গ্রহণযোগ্য হবে। অন্য কারো ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাই আয়াতে বর্ণিত 'খাতাম' শব্দের সঠিক ব্যাখ্যা 'সর্বশেষ'। 'মোহর' নয়। সুতরাং সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলো, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাতামুন্নাবিয়্যিন বা সর্বশেষ নবী।

প্রশ্ন : দাড়ি বড় করা কি ওয়াজিব? ওয়াজিব হলে কতটুকু পরিমাণ ওয়াজিব?

উত্তর : আমরা হাদীস পেয়েছি হযরত সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে। অতএব হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাদের ব্যাখ্যাই হবে সর্বাগ্রে গ্রহণযোগ্য। তাদের ব্যাখ্যা থাকতে অন্য কারো ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

এবার আমরা দাড়ির হাদীসের দিকে দৃষ্টিপাত করি। দাড়ি লম্বা করতে হবে। এ মর্মে আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশ জানতে পেরেছি সাহাবায়ে কেরামের হাদীস বর্ণনার দ্বারা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকটতম সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. এর হাদীস–

عن ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب . وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه

হযরত ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা করো। দাড়ি লম্বা করো। আর গোঁফ খাট করো।

আর ইবনে ওমর রাযি. যখন হজ্ব বা ওমরা করতেন, তখন তিনি তার দাড়িকে মুঠ করে ধরতেন, তারপর অতিরিক্ত অংশ কেটে ফেলতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৫৫৫৩]

এখানে লক্ষ্যণীয় হলো- সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনার দ্বারা আমরা জানতে পারলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের দাড়ি বড় করতে নির্দেশ দিচ্ছেন।

আর আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশসূচক শব্দ যেখানে আসে, সেক্ষেত্রে উসূলবীদদের মূলনীতি হলো নির্দেশ মানেই উক্ত কাজটি করা ওয়াজিব। তবে যদি ওয়াজিব না হওয়ার কোনো দলীল স্পষ্ট থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।

যেহেতু উক্ত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাড়ি বড় রাখার যে আদেশ দিলেন, তা ওয়াজিব না হওয়ার কোনো স্পষ্ট দলীল কোথাও বিদ্যমান নেই তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদেশ অনুপাতে দাড়ি বড় রাখা ওয়াজিব হচ্ছে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো বড় করার অর্থ কী? বড় করতে আদেশ দিলেন তাই বড় করা সকল মুমিনের ওপর আবশ্যক। কিন্তু কতটুকু বড় রাখবে। এর কোনো সীমা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেননি। আর দাড়ি শুধু বড় করতে গেলে তা পা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে এ বড় করার একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। যেটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝিয়েছেন।

এখন আমরা দাড়ি বড় করার সীমা তথা বড় করার ব্যাখ্যা কার কাছ থেকে নিব। এখানেও দু'টি পদ্ধতি। একটি হলো নিজের ইচ্ছেমত বলে দিব যে, দাড়ি দূর থেকে দেখা গেলেই বড় রাখা হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে। দূর থেকে দেখা যাওয়া মানেই হলো দাড়ি বড় রাখা হয়েছে। তথা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশ দাড়ি বড় করা আদায় হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, হাদীসটি কার মাধ্যমে পেলাম? কার বলার দ্বারা হাদীসটি হাদীস হলো? কার ঠোঁট নড়ার দ্বারা হাদীসটি হাদীস হিসেবে স্বীকৃতি পেল? কে না বললে হাদীসটি হাদীস হতো না? সেই ব্যক্তির ব্যাখ্যা গ্রহণ করা। আরো সহজ ভাষায় বলা যায়, যার মাধ্যমে উক্ত হাদীসটি পেলাম, যার ঠোঁট নড়ার দ্বারা উক্ত হাদীসটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেল, যিনি না বললে উক্ত কথাটি হাদীস হতো না সেই সাহাবীর ব্যাখ্যা গ্রহণ করা।

এক্ষেত্রে আমরা বলব, যাঁর মাধ্যমে হাদীস পেলাম তার ব্যাখ্যাই গ্রহণ করব। কোনো আবোল তাবোল গবেষকের মনগড়া ব্যাখ্যা আমরা গ্রহণ করব না। আর আমরা দেখি যে, বুখারী শরীফে ইমাম বুখারী রহ. আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাযি. থেকে দাড়ি বড় রাখার নির্দেশসূচক হাদীসটি বর্ণনা করার পর হাদীস বর্ণনাকারী ইবনে ওমর রাযি. এর আমল উল্লেখ করেছেন যে, তিনি দাড়ি মুঠ করে ধরে তারপর কেটে ফেলতেন। এর মানে হলো উক্ত হাদীস বর্ণনাকারী ইবনে ওমর রাযি. জানিয়ে দিলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশ 'দাড়ি বড় করো'-এর অর্থ হলো 'এক মুষ্টি পর্যন্ত বড় করো'।

তাই দাড়ি বড় করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশের মাধ্যমে ওয়াজিব। আর বড় করার ব্যাখ্যা হলো হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত ইবনে ওমর রাযি. এর আমল দ্বারা এক মুষ্টি। সুতরাং এক মুষ্টি দাড়ি রাখা ওয়াজিব। [উসূলুশ শাশী, নূরুল আনোয়ার]

প্রশ্ন : আল্লাহ যা করেন আমাদের মঙ্গলের জন্য করেন। এই বাক্যের সত্যতা যাচাইয়ে কুরআন ও হাদীসের দলীল কী?

উত্তর : পবিত্র কুরআনে সূরা জ্বিনে আল্লাহ তাআলা বলেন, আমরা জানি না দুনিয়াবাসীদের প্রতি কী অকল্যাণের ইচ্ছা করা হয়েছে, নাকি তাদের প্রভু তাদের ব্যাপারে কল্যাণের ইচ্ছা করেছেন।

এ আয়াতে জ্বিনদের কথায় আল্লাহ তাআলার প্রতি বান্দার আদব কেমন হওয়া উচিৎ, তার চমৎকার উদাহরণ পাওয়া যায়।

জ্বিনরা 'মঙ্গলের' কর্তা সরাসরি আল্লাহকে বলেছে। অথচ 'অমঙ্গলের' কর্তা তারা অস্পষ্ট রেখেছে। এটাই আদব। অর্থাৎ মঙ্গলকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা আর অমঙ্গলকে নিজের কৃতকর্মের সাথে সম্পৃক্ত করা।

হাদীসে আছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই দোয়ায় বলতেন, হে আল্লাহ! মঙ্গল তো আপনার হাতে। আর অমঙ্গল আপনার সাথে সম্পৃক্ত নয়। [মুসতাদরাক, হাদীস নং : ৩৩৮৪]

এছাড়া খুতবার শুরুতেও তিনি বলতেন, আমরা আপনার কাছে আমাদের নিজেদের অমঙ্গল থেকে এবং আমাদের কৃতকর্মের খারাবি থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

এখানেও দেখুন, তিনি যাবতীয় অমঙ্গলকে নিজের/কৃতকর্মের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। অথচ মঙ্গল-অমঙ্গল সবকিছুর স্রষ্টাই কিন্তু আল্লাহ। যেমন আমরা ঈমানের ক্ষেত্রে বলি– আমরা তাকদীরের ব্যাপারে বিশ্বাস রাখি যে, মঙ্গল-অমঙ্গল সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে।

আসলে ব্যাপারটা হলো, মঙ্গল-অমঙ্গল বিষয়টা আপেক্ষিক। যেমন ধরুন, কোথাও খুব বৃষ্টি হলো। এতে একজন যেমন গরম থেকে নিস্তার পেয়ে আরাম পাবে, আরেকজন বিবিধ ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এতে

বোঝা যাচ্ছে, একই জিনিস একজনের দিকে লক্ষ্য করলে মঙ্গল হতে পারে, অপরজনের দিকে লক্ষ্য করলে অমঙ্গল হতে পারে। অতএব আল্লাহ যা করেন, তার সবই মঙ্গল। হয়তো কখনো কোনো বান্দার দিকে লক্ষ্য করলে তাকে অমঙ্গল মনে হয়, কিন্তু আল্লাহর দিকে লক্ষ্য করলে তা অবশ্যই মঙ্গল। কারণ, পরিণতিতে সেটাও কোনো না কোনো মঙ্গলের কারণ হয়। দুনিয়াতে বা আখিরাতে। আর এসব কারণেই বলা হয়– 'আল্লাহ্ যা করেন, মঙ্গলের জন্য করেন'।

প্রশ্ন :

ক. যেসব হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইহুদি ইসলামের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায় না, অথচ তারা পৃথিবীতে অনেক ভালো কাজ করেন, তাদের ব্যাপারে ইসলাম কী বলে?

খ. যেসব খ্রিস্টান এক আল্লাহ ও ঈসা আ.–এর ওপর বিশ্বাস রাখেন, তাদের কী হবে?

গ. যেসব এলাকার লোকদের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছেনি, তাদের কী বিধান?

উত্তর : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রতিটি মানুষকে জ্ঞান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যে জ্ঞান তাকে এমনিতেই স্রষ্টা যে একজন আছেন এবং তিনিই তাকে সৃষ্টি করেছেন, বুঝতে সাহায্য করবে। পরে এই বুঝের ওপর নির্ভর করে সে সত্য ধর্ম সম্পর্কে অনুসন্ধান করবে। এবং এক পর্যায়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করবে।

এই 'জ্ঞান'-ই আল্লাহর বাণীতে উল্লিখিত 'ফিতরাত'। তিনি বলেন–

فطرة الله التي فطر الناس عليها

এ হচ্ছে ফিতরাত, যার ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা সব নবজাতককে ফিতরাতের ওপর সৃষ্টি করেন। পরে তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজক বানায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, তোমরা তো বিভিন্ন পশু দেখেছ। কোনো পশু কি শরীরে চিহ্ন নিয়ে জন্মায়? না। বরং তাকে পরে চিহ্নিত করা হয়।

আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে অনেক নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। যে যুগে যাঁকে পাঠিয়েছেন, সে যুগে তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করাই ছিল সঠিক পথ। সর্বশেষ তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠান। এরপর একমাত্র তাঁর পথই সঠিক পথ। অন্য সব পথ ভ্রান্ত ও বাতিল।

আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন অন্বেষণ করে, তিনি তা তার কাছ থেকে কখনো কবুল করবেন না। এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

পূর্বের কোনো ধর্মের অনুসারী যখন ইসলাম আগমনের পর ইসলামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, তার জন্য বেশি সওয়াবের ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, যারা ঈমান এনেছে, এবং ইহুদি, খ্রিস্টান ও সাবীদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে, আবার সৎ কর্মও করেছে, তাদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে প্রতিদান। দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের কোনো ভয় ও চিন্তা নেই।

ইহুদি, খ্রিস্টান যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি তাদের সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সেই মহান সত্ত্বার শপথ যার কবযায় আমার প্রাণ, এই উম্মতের কোনো ইহুদি, খ্রিস্টান যদি আমার কথা শুনে, এরপর আমার আনীত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আগেই মারা যায়, তাহলে সে জাহান্নামবাসী হবে। [মুসলিম]

অপর হাদীসে তিনি বলেন, আমার উম্মতের সবাই জান্নাতে যাবে, তবে যে অস্বীকৃতি জানায় সে ছাড়া। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! অস্বীকৃতি জানায় কে? তিনি বললেন, যে আমার অনুসরণ করবে সে জান্নাতে যাবে। আর যে আমার আমার অনুসরণ করবে না, সে জাহান্নামে যাবে। [বুখারী]

বস্তুতঃ আল্লাহ কারো ওপর জুলুম বা অবিচার করেন না। মানুষ নিজেই নিজের ওপর অবিচার করে। যেমন আল্লাহ তআলা বলেছেন,

আল্লাহ্ মানুষের ওপর একটুও অবিচার করে না। মানুষ নিজেই নিজের ওপর অবিচার করে।

অপর এক আয়াতে তিনি বলেন, আল্লাহ্ অনু পরিমাণও কারো ওপর জুলুম করেন না। যদি একটি সৎ কাজ কেউ করে, তাহলে তিনি তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেন। এবং নিজ থেকে তাকে বড় প্রতিদান দেন।

এবার আসুন ওপরের প্রশ্নগুলোর বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করি—

প্রশ্ন-১ : যেসব হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদি-খ্রিস্টান ইসলামের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায় না, অথচ তারা পৃথিবীতে অনেক ভালো কাজ করে যান, তাদের ব্যাপারে ইসলাম কী বলে?

উত্তর : যেহেতু আল্লাহ্ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান তাদের ছিল এবং ইসলাম সম্পর্কে জানার যথেষ্ট উপকরণ তারা পেয়েছিলেন, এরপরও তারা ইসলাম গ্রহণ করেননি, তাই তারা জান্নাতে যেতে পারবেন না। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ্ কারো ওপর জুলুম করেন না। তারা যা ভালো কাজ করেছেন, এর প্রতিদান পৃথিবীতে তাদের দিবেন। মানুষ তাদেরকে চিনেছে, জেনেছে। তাদের মৃত্যুর পরও তাদের সুনাম পৃথিবীর মানুষ করেছে। তাদের ভালো কাজের পার্থিব প্রতিদান আল্লাহ্ এভাবে দিয়েছেন।

কিন্তু পরলৌকিক প্রতিদানের জন্য যেহেতু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা শর্ত, যা তাদের বেলায় অনুপস্থিত, তাই তারা পরলৌকিক কোনো প্রতিদান পাবেন না।

প্রশ্ন-২ : যেসব খ্রিস্টান এক আল্লাহ্ ও ঈসা আ. এর ওপর বিশ্বাস রাখেন, তাদের কী হবে?

উত্তর : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমনের পর তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনই একমাত্র দীন। কাজেই তাঁর প্রতি বিশ্বাস না থাকায় তাদের অবস্থাও প্রথম উত্তরে উল্লিখিত মানুষের অবস্থার অনুরূপ হবে।

প্রশ্ন-৩ : যেসব এলাকার লোকদের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছেনি, তাদের কী বিধান?

উত্তর : তাদের ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে কিছুটা মত পার্থক্য রয়েছে। কোনো কোনো ইমামের মতে, যাদের কাছে কোনো নবী ও রাসূলের

দাওয়াত পৌঁছেনি কাফের হয়ে মারা যাওয়া সত্ত্বেও তাদের কোনো আযাব বা শাস্তি হবে না। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ইসলামের যেসব বিষয় আকল তথা বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা বোঝা যায় যেমন, আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর একত্ববাদ– সেগুলো যারা অস্বীকার করে কুফরের কারণে তাদের আযাব হবে; যদিও তাদের কাছে নবী ও রাসূলের দাওয়াত না পৌঁছে থাকে। তবে নবী ও রাসূলের দাওয়াত ব্যতীত সাধারণ গোনাহের কারণে আযাব হবে না। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে হিদায়াতের পথে চলার তাওফীক দিন। আমীন।

প্রশ্ন : নাস্তিকতার ভয়ঙ্কর ছোবলে যুবসমাজ : করণীয় কী?

উত্তর : গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী '১৩ রাজধানী ঢাকায় জনৈক নাস্তিক ব্লগার রাজীব হায়দারের নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে নাস্তিকতার যে ভয়াল চিত্র উন্মোচিত হয়েছে, তা সমগ্র দেশবাসীকে স্তম্ভিত করেছে। নাস্তিকতা যে কত নিকৃষ্ট হতে পারে, ধর্মহীনতা যে মানুষকে নৈতিক অবক্ষয়ের কোন্ অতলে নিক্ষেপ করতে পারে, তার এক বাস্তব প্রতিমূর্তি অত্যন্ত প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে এই চিত্রে।

লক্ষ্যণীয় যে, ইন্টারনেটে অবাধ তথ্যপ্রবাহের সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশে গত কয়েক বছর ধরে নাস্তিকতার প্রচার ও প্রসার বেশ জোরালোভাবে শুরু হলেও কোনো এক অজানা কারণে গণমাধ্যমে এ সম্পর্কে কোন রিপোর্ট বা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়নি। ফলে এ দেশে নাস্তিকতার এই ভয়ংকর রূপটি জনসমাজে এক প্রকার অজ্ঞাতই ছিল। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এই ইসলামবিদ্বেষী নাস্তিক চক্রটি দিনে দিনে শক্তিশালী হয়ে দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া তরুণ শিক্ষার্থীদের মগজ ধোলাইয়ের জন্য সুদূরপ্রসারী মিশন গ্রহণ করে। এ মিশন যে বেশ সাফল্যের সাথেই এগিয়ে চলেছে রাজীব হায়দার গংদের এই ঘৃণ্যতম দুঃসাহসিক অপতৎপরতা তারই প্রমাণ বহন করে। এদের মরণ ছোবলের শিকার হয়ে শহুরে শিক্ষিত তরুণ সমাজের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নিজের দীন-ধর্ম সম্পর্কে বিপজ্জনকভাবে বীতশ্রদ্ধভাব ও সংশয় পোষণ করা শুরু করেছে।

শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের এই দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমের জীবনাচারকে বিশুদ্ধ ঈমান-আক্বীদার প্রশ্নে কোনোভাবেই সন্তোষজনক বলা

না গেলেও এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ধর্ম এখানকার জনজীবনে একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। ধর্মপালনে শিথিলতা থাকলেও মানুষের মধ্যে ধর্মানুভূতি যথেষ্ট তীব্র। ফলে দীর্ঘদিন যাবৎ এ দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় সুকৌশলে ধর্মহীনতা প্রসারের ব্যাপক চেষ্টা পরিলক্ষিত হলেও প্রকাশ্যভাবে ধর্মদ্রোহিতা বা নাস্তিকতার কোন স্থান কখনই হয়নি। তাই যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক না কেন, জনগণকে পক্ষে টানার জন্য অন্ততঃ ভোটের সময় হলেও ধর্মের গুণগান করতে দেখা যায়। যে কারণে দাউদ হায়দার, আহমাদ শরীফ, তাসলিমা নাসরীনের মত গুটিকয় ধর্মবিদ্বেষী নাস্তিক; যারা সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিল, বাংলাদেশের গণমানুষের হৃদয়ের গভীরে তাদের তো কোন আশ্রয় হয়ই-নি; বরং তাদের বিরুদ্ধে পুঞ্জিভূত হয়েছে প্রবল ক্ষোভ ও ঘৃণাবোধ। এমনকি তাদের অনেককেই শেষ পর্যন্ত দেশ ছাড়তে বাধ্য হতে হয়েছে।

কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে ইন্টারনেটের প্রসার ঘটায় জনসাধারণের নাগালের বাইরে বাংলা ব্লগ জুড়ে যে এক শ্রেণীর নাস্তিকচক্র গড়ে উঠেছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে সেখানে যে উদ্বেগজনক ও কুৎসিত অপপ্রচার শুরু করেছে, তা পূর্ববর্তী নাস্তিকদের সকল অপতৎরতাকে বহুগুণে ছাড়িয়ে গেলেও তাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ কোনো প্রতিরোধ গড়ে উঠেনি। এর কারণ হলো, এদের অবস্থান সমাজে নয় বরং ইন্টারনেটের ভার্চুয়াল জগতে। প্রকৃতপক্ষে ইন্টারনেটে বাংলা ব্লগ সম্পর্কে যাদের ধারণা নেই, তারা কল্পনাও করতে পারবেন না যে, বাংলাদেশে এত বিরাট সংখ্যক নাস্তিক ঘাপটি মেরে আছে। অনেককেই বলতে শুনেছি, ব্লগে না আসলে বাংলাদেশে যে এত নাস্তিক আছে, তা হয়ত জানতেই পারতাম না। অবশেষে ব্লগার রাজীব নিহত হওয়ার প্রেক্ষিতে এই নাস্তিক চক্রের ভয়াবহ অপতৎপরতা জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ না পেলে, তারা হয়ত আরো অনেকদিন সাধারণ মানুষের অগোচরেই থেকে যেত।

পাঠকদের অনেকেরই প্রশ্ন, ইন্টারনেটভিত্তিক ব্লগিং আসলে কী এবং ব্লগারদের মধ্যে নাস্তিকতার এত প্রসার কেন? মূলতঃ ইংরেজী শব্দ 'ব্লগ' হল ওয়েবলগ-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি এমন একটি ওয়েবসাইট যাকে তুলনা করা যায় ব্যক্তিগত ডায়েরীর সাথে। অন্যভাবে এগুলোকে উন্মুক্ত অনলাইন ম্যাগাজিনও বলা যায়। ইন্টারনেটে নিজস্ব ব্লগসাইট বানিয়ে দৈনন্দিন ডায়েরী লেখার মত অনেকেই লেখালেখি করে থাকেন।

যিনি ব্লগে লেখালেখি করেন তাকে 'ব্লগার' বলে। এ সকল ব্লগে একাউন্ট খুলে লেখালেখির মাধ্যমে ব্লগের অন্যান্য সদস্যদের সাথে খুব নির্বিঘ্নে মতের আদান-প্রদান করা যায়।

বাংলাভাষায় সামাজিক ব্লগ হিসাবে ২০০৫ সালে সর্বপ্রথম 'সামহয়্যার ইন ব্লগ'-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। ইন্টারনেটের প্রসার লাভ করার সাথে সাথে ব্লগিং-এর জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকলে একে একে সৃষ্টি হয় নাগরিক ব্লগ, আমার ব্লগ, প্রথম আলো ব্লগ, সোনারবাংলা ব্লগের মত জনপ্রিয় ব্লগগুলো। কখনো লেখালেখির অভ্যাস ছিল না, এমন বহু তরুণের লেখার হাতেখড়ি হয়েছে ব্লগের মাধ্যমে। যদিও ইদানিং ফেসবুক-টুইটারের দাপটে ব্লগসাইটের জনপ্রিয়তা বেশ কমে এসেছে। ব্লগগুলোর জনপ্রিয়তার মূল কারণ ছিল, ব্লগ মডারেটরদের বেঁধে দেয়া সাধারণ কিছু নীতি মেনে স্বাধীনভাবে যে কোনো বিষয়ে নিজের মত প্রকাশ করা এবং অন্যের কাছে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি পৌঁছে দেয়ার অনন্য সুযোগ পাওয়া। নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে ব্লগের এই অভূতপূর্ব স্বাধীনতার কোনো জুড়ি নেই। ফলে সরকারী বিধি-নিষেধের আওতার বাইরে অবাধ ও স্বাধীন মতপ্রকাশের এই উন্মুক্ত অঙ্গনটি ধর্মবিদ্বেষী নাস্তিকদের জন্য বিরাট সুবিধা ও সুযোগ নিয়ে আসে। যেহেতু এ দেশে সামাজিকভাবে ধর্মবিরোধী নাস্তিকদের কোনো ঠাঁই নেই, তাই এই নিরাপদ (!) স্থানে এসে তারা কখনও স্বনামে কিংবা বেশিরভাগই বেনামে মনের সুখে নাস্তিকতার প্রচার ও ধর্মবিদ্বেষ ছড়ানোর মওকা পেয়ে যায়। অন্যদিকে 'উদারমনা' নাস্তিক্যবাদী বিভিন্ন ব্লগ মডারেটররাও 'মুক্তচিন্তা' প্রকাশের নামে এদেরকে সাদরে ঠাঁই দিতে থাকে।

অবশ্য ব্লগিং মানেই নাস্তিকতা নয়। কেননা ব্লগীয় পরিমণ্ডলে স্বল্পসংখ্যক নাস্তিক গোষ্ঠীর বিপরীতে সুস্থ ও মননশীল চিন্তাধারার প্রচুর সংখ্যক ধর্মপ্রাণ ও সৃষ্টিশীল লেখক রয়েছেন। বরং তাদের বিপরীতে নাস্তিকদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য বলা যায়। যারা নিজেদের মূল্যবান সময় ও মেধা ব্যয় করে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে যেমন তৎপর রয়েছেন, তেমনি নাস্তিকদের যুক্তি-কুযুক্তির শিকড় উপড়ে ফেলার যুদ্ধে অত্যন্ত দৃঢ় ভূমিকা রেখে চলেছেন।

ব্লগে বিচরণশীল নাস্তিকরা মূলতঃ ৩ ভাগে বিভক্ত।

১. যারা ঘটনাক্রমে কিংবা পরিবেশগত কারণে ধর্মবিরোধী হয়ে উঠেছে এবং ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে নেতিবাচক সমালোচনায় লিপ্ত হয়ে থাকে। তবে সাধারণতঃ কিছুটা সংযত ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের সুশীলতা প্রমাণে সচেষ্ট থাকে। এই শ্রেণীর ভদ্রবেশী নাস্তিকের সংখ্যা অবশ্য ব্লগে খুব নগণ্যই।

২. যারা প্রবল ধর্মবিদ্বেষী। এরা এমনই উগ্র যে, যে কোনো সুযোগে অত্যন্ত অশ্লীল ও ক্লেদাক্ত ভাষায় ধর্মকে আক্রমণ করে। কুরআনের আয়াতসমূহ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যক্তিজীবন ও ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাবলী নিয়ে মিথ্যা ও কুরুচিপূর্ণ অপবাদ আরোপ করা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করাই তাদের প্রধান কাজ। তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো জঘন্য ও অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করা। তাদের চিন্তাধারা ও গালাগালির রূপ-প্রকৃতি এতটাই নিম্নরুচির যে, তাদেরকে সাধারণভাবে মনুষ্যশ্রেণীভুক্ত ভাবতেই কষ্ট হয়। ব্লগে এই প্রকার ইতর শ্রেণীর নাস্তিকের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি।

৩. যারা সরাসরি ধর্মের বিরুদ্ধে লেখালেখি করে না, নিজেদের নাস্তিকও বলে না। তবে ধর্মবিরোধী আলোচনায় নাস্তিকদের প্রতি তারা সহানুভূতিশীল। তারা সংশয়বাদী, অজ্ঞেয়বাদী, যুক্তিবাদী, মানবতাবাদী, সুশীল, উদারমনা ইত্যাদির ছদ্মাবরণে প্রকারান্তরে নাস্তিক্যবাদের সেবাদাস হিসাবেই কাজ করে। ব্লগে এই শ্রেণীর নাস্তিকের সংখ্যাও প্রচুর।

তবে মজার ব্যাপার এই যে, নীতিগতভাবে সর্বধর্মবিরোধী হলেও কার্যক্ষেত্রে এসব নাস্তিকদের একমাত্র টার্গেট হলো ইসলাম। ইসলামই তাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্যবস্তু। শোনা যায়, নাস্তিক ব্লগারদের অনেকেই নাকি মূলতঃ হিন্দু। যারা স্বার্থসিদ্ধির জন্য মুসলিম নাম ব্যবহার করে এবং ইসলামকে হেয় করার চেষ্টা করে। মুক্ত সামাজিক ব্লগগুলোতে তাদের নীতি হল, প্রথমে রাজাকার ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সাইনবোর্ড নিয়ে সাধারণ ব্লগারদের সহানুভূতি আদায় করা। অতঃপর সুযোগ মত ধর্মবিদ্বেষের ছোবল মারা। এদের নিজস্ব কিছু ব্লগও রয়েছে। যেমন মুক্তমনা, আমার ব্লগ, ধর্মকারী, নবযুগ প্রভৃতি।

এসব ব্লগে তারা উগ্র ধর্মবিদ্বেষের এমনই বিষবাষ্প ছড়ায়, নোংরামী আর ঘৃণ্য মনোবৃত্তির এমন দুর্গন্ধময় প্রদর্শনী করে, যা কোনো সভ্য সমাজে অকল্পনীয়। বরং চাক্ষুষ না দেখলে তা বিশ্বাসই করা যায় না। অথচ 'সোনারবাংলা', 'সদালাপ', 'বিডিটুডে'র মত কতিপয় ইসলামপন্থী ব্লগ ছাড়া বাকি সমস্ত ব্লগই নীতিমালায় 'ধর্মবিদ্বেষ ছড়ানো নিষিদ্ধ' লিখে রাখার পরও কম-বেশি এই শ্রেণীর নাস্তিকদের আশ্রয় দিয়ে আসছে। নিম্নে নাস্তিক চক্রের পরিচালিত প্রসিদ্ধ ব্লগ 'ধর্মকারী' থেকে তাদের উগ্র ইসলামবিদ্বেষের দু'একটি নমুনা দেয়া হল।

ধর্মকারী'র হোম পেইজের চলমান স্লোগানে দেখা যায়, 'আল্লাহ সর্বব্যাপী তিনি বরাহেও আছেন, বিষ্ঠাতেও আছেন। আল্লাহ সর্বব্যাপী, তিনি বোরখাতেও আছেন, বিকিনিতেও আছেন। আল্লাহ সর্বব্যাপী, তিনি জলাশয়েও আছেন, মলাশয়েও আছেন। আল্লাহ সর্বব্যাপী, তিনি উটমূত্রেও আছেন, কামসূত্রেও আছেন'। নাউযুবিল্লাহ!

হোম পেজের ডানদিকে ব্লগের পরিচয় সম্পর্কে বলা হয়েছে- 'ধর্মকারী যুক্তিমনস্কদের নির্মল বিনোদনের ব্লগ। বিতর্ক বা বাকবিতণ্ডার স্থান নেই এখানে। এই ব্লগে ধর্মের যুক্তিযুক্ত সমালোচনা করা হবে, ধর্মকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হবে, অপদস্থ করা হবে, ব্যঙ্গ করা হবে। যেমন করা হয়ে থাকে সাহিত্য, চলচ্চিত্র, খেলাধুলা বা অন্যান্য যাবতীয় বিষয়কে।'– এই শ্লোগান ঝুলিয়ে রেখে ব্লগটির সর্বত্র অবর্ণনীয় নোংরামী সহকারে যাচ্ছেতাই ভাবে ইসলামকে অবমাননা করা হয়েছে। যেমন- সম্প্রতি পোস্ট করা হয়েছে এমন কয়েকটি লেখার শিরোনাম ছিল এমন- 'ইসলামী ইতরামি', 'নিঃসীম নূরানী অন্ধকারে', 'ধর্মাতুল কৌতুকিম', 'ইসলামে বর্বরতা'।

শুধু তাই নয়, পবিত্র কুরআনের ভাষা অবিকল নকল করে ব্যঙ্গ প্যারোডি রচনা করা, হাদীসকে 'হা-হা-হাদীস' বলে টিটকারীর মাধ্যমে যে জঘন্যতম বমন উদ্রেককারী বিকৃতরুচির লেখা তারা সেখানে স্থান দিয়েছে, তা জনস্বার্থে প্রকাশ করতে চাইলেও কোনো মতেই বিবেকে সায় দিচ্ছে না। সেখানে সাইডট্যাবে বিজ্ঞাপন আকারে সংযুক্ত করা হয়েছে ৭টি সচিত্র কমিক ই-বুক। ব্যঙ্গ করে যেসব বইকে বলা হয়েছে 'ধর্মকারী কিতাব'। এর মধ্যে সবচেয়ে বীভৎস কমিক বইটি রচিত হয়েছে 'হজরত মহাউন্মাদ ও কোরান-হাদীস রঙ্গ' শিরোনাম দিয়ে। জনৈক আব্দুল্লাহ আজীজ রচিত ২৬ পৃষ্ঠার বইটিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনচরিত

নিয়ে এত অশ্লীল কার্টুনচিত্র আর জঘন্য কোলাজ রচনা করা হয়েছে, যা কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষে স্বচক্ষে দেখা সম্ভব নয়। নরকের কীট, সাক্ষাৎ শয়তান এই কুলাংগার কিভাবে এ দেশের মাটিতে বসে এমন একটি বই রচনার দুঃসাহস পেল, তা ভাবতেও গা শিউরে উঠে।

এই ব্লগে নিহত ব্লগার রাজীবও 'থাবা বাবা' ছদ্মনামে লিখত। 'নূরানী চাপা শরীফ' শিরোনামে সে এখানে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামসহ মুসলমানদের ঈদ উৎসব নিয়ে জঘন্যতম কটূক্তি ও কুরুচিপূর্ণ লেখা লিখেছে। যা ইতিমধ্যে দেশের জাতীয় দৈনিকসমূহে প্রকাশিত হয়েছে।

ইন্টারনেটে তথাকথিত প্রগতিশীল ও মানবতাবাদী নাস্তিকদের এই নোংরা ও কদর্য অপপ্রচার যে বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। তারা চায় এ দেশকে পুরোপুরি ধর্মহীন সেক্যুলার রাষ্ট্রে পরিণত করতে। আর এই ধর্মহীনতার মধ্যেই তারা খুঁজতে চায় বাঙালীর নবজাগরণ (?)।

বাংলাদেশে ইসলামবিদ্বেষী লেখালেখির সুতিকাগার খ্যাত 'মুক্তমনা'র পরিচিতিতে লেখা হয়েছে-"'মুক্তমনা'র মাধ্যমে আমরা একদল উদ্যমী স্বাপ্নিক দীর্ঘদিনের একটি অসমাপ্ত সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে পরিচালনা করছি, যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন আক্ষরিক অর্থেই হয়ে উঠছে 'চেতনামুক্তির' লড়াই। যার মাধ্যমে জনচেতনাকে পার্থিব সমাজমুখী (অর্থাৎ ধর্মহীন) করে তোলা সম্ভব। আজ ইন্টারনেটের কল্যাণে বিশ্বাস (ধর্ম) এবং যুক্তির সরাসরি সংঘাতের ভিত্তিতে যে সামাজিক আন্দোলন বিভিন্ন ফোরামগুলোতে ধীরে ধীরে দানা বাঁধছে, মুক্তমনারা মনে করে তা প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ-চার্বাকদের লড়াইয়ের মত বিশ্বাস ও যুক্তির দ্বন্দ্বেরই একটি বর্ধিত, অগ্রসর ও প্রায়োগিক রূপ। এ এক অভিনব সাংস্কৃতিক আন্দোলন, যেন বাঙালীর এক নবজাগরণ"।

এই ব্লগের প্রধান কর্ণধার স্বঘোষিত নাস্তিক অভিজিৎ রায় হলো আমেরিকা প্রবাসী পিএইচডি ডিগ্রিধারী বর্ণবাদী হিন্দু। এই উগ্র ইসলামবিদ্বেষী বর্তমানে বাংলাদেশের নাস্তিকদের আধ্যাত্মিক গুরু হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে তার রচনায় ও সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে

'অবিশ্বাসের দর্শন', 'বিশ্বাস ও বিজ্ঞান', 'ধর্ম ও নিধর্ম সংশয়', 'স্বতন্ত্র রচনা : মুক্তচিন্তা ও বুদ্ধির মুক্তি', 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' ইত্যাদি উগ্র নাস্তিক্যবাদী চিন্তাধারার বইসমূহ।

এতো গেল কেবল বাংলা ব্লগের কথা। বর্তমানে ব্লগের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী, অবাধ ও স্বাধীন মুক্তমঞ্চ হিসাবে গড়ে উঠেছে ফেসবুক, টুইটারের মত সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমসমূহ। যেখানে প্রতিদিন বহু ইসলামীবিদ্বেষী বাংলা পেজ খোলা হচ্ছে। সেসব পেজে সমানে ছড়ানো হচ্ছে হিংসা ও ঘৃণার বিষাক্ত মন্ত্র। পবিত্র কুরআনের আয়াতের অনুকরণে ব্যাঙ্গাত্মক প্যারোডি রচনা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে গালিগালাজের সে সব দৃশ্য; যাদের মধ্যে সামান্যতম ঈমান অবশিষ্ট রয়েছে, তাদের হৃদয়েও রক্তক্ষরণ না ঘটিয়ে পারবে না।

শাহবাগ আন্দোলনে এই নাস্তিক ব্লগার গোষ্ঠীই প্রথম রাস্তায় নেমেছিল। 'যুদ্ধাপরাধের বিচার' ছিল তাদের সাইনবোর্ড। কিন্তু অন্তরালে লুক্কায়িত ছিল ব্লগের ক্ষুদ্র মঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসে সমাজের বৃহত্তর অঙ্গনে নিজেদের একটা অবস্থান তৈরি করার চেষ্টা এবং পরম কাংখিত সেই নাস্তিক্যবাদী সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বীজ বপন করা। যার মাধ্যমে এ দেশের গণমানুষের মন ও মনন থেকে ধর্ম নামক অনুষঙ্গটির শেষ শিকড়টিও তারা উপড়ে ফেলতে চেয়েছিল। 'একাত্তরের চেতনা'র মুলো ঝুলিয়ে এবং ইসলাম ও মুক্তিযুদ্ধকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে তারা মীমাংসা করে ফেলতে চেয়েছিল এ দেশের জাতীয় চেতনা ও সংস্কৃতিতে ইসলাম নামক এই 'আরবীয় ধর্মে'র (?) আর কোনো স্থান থাকবে কিনা সেই প্রশ্নটিরও।

এ কথা সত্য যে, এতকিছুর পরও বাংলাদেশে উঠতি নাস্তিকদের এই সীমাহীন দৌরাত্ম মূলত ইন্টারনেট অঙ্গনেই সীমাবদ্ধ। এর বাইরে সমাজে প্রকাশ্যে নাস্তিকতার চর্চা করার মত মেরুদণ্ড যে এদের নেই, তা শাহবাগ আন্দোলনের ব্যর্থতায় পরিস্কার। কিন্তু তাতে কী? শিক্ষিত উঠতি তরুণ সমাজের হাতে ইন্টারনেট এখন অনেক সহজলভ্য। ফলে অত্যন্ত উদ্বেগজনকভাবে তারাই সর্বপ্রথম এই নাস্তিকদের অপপ্রচার ও মগজধোলাইয়ের শিকার হচ্ছে।

সাম্প্রতিক অতীতে তরুণদের মস্তিষ্ক বিকৃত করার জন্য আরজ আলী মাতুব্বর, আহমাদ শরীফ, হুমায়ূন আজাদদের অনুসারীদের সংখ্যা এ দেশে নিতান্তই কম ছিল না। তথাকথিত বিজ্ঞানমনস্ক ও মানবতাবাদী কবি-সাহিত্যিকরা এবং সেক্যুলার মিডিয়াগুলো এতদিন আড়ালে-আবডালে সংগোপনে সুকৌশলে নাস্তিকতা প্রচার করে আসছিল। কিন্তু বর্তমানের নাস্তিকরা তাদের চেয়ে বহু গুণ বেশি ভয়ঙ্কর।

যে দেশে দাউদ হায়দার, তাসলিমা নাসরীনদের ঠাঁই হয় না, সেই দেশে তাদের চেয়ে হাজার গুণ বর্বর এই উগ্র নাস্তিক গোষ্ঠী কীভাবে বহাল তবিয়তে টিকে থাকে, তা আমাদের বোধগম্য নয়। তবে কি এর পিছনে কোনো মহলের বিশেষ মিশন কাজ করছে? ২০১১ সালে আমেরিকার 'সেন্টার ফর আমেরিকান প্রগ্রেস' আমেরিকায় ইসলামোফোবিয়া কিভাবে ছড়ানো হচ্ছে তার ওপর ৬ মাস ব্যাপী তদন্ত চালায়। অতঃপর Fear, Inc. The Roots of the Islamopwqbia Network in America শিরোনামে ১৩০ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি গবেষণা রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্ট মতে, আমেরিকার ৭টি সংস্থা গত ১০ বছরে ৪২ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানোর কাজে। যার একটি বড় অংশ ব্যয় করা হয় ইন্টারনেটে ইসলামবিদ্বেষী ম্যাটেরিয়াল সমৃদ্ধ করা এবং বিভিন্ন ফোরাম ও ব্লগের মাধ্যমে হিংসা ছড়ানোর কাজে। সুতরাং এ দেশের যুবসমাজকে ধ্বংস করার জন্য এই নাস্তিক চক্রকে বিশেষ কোনো মহল পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে কিনা, তা অনতিবিলম্বে খতিয়ে দেখা জরুরি।

ইতিপূর্বে বাংলাদেশ সরকার 'সাইবার ক্রাইম' বিষয়ক আইন করলেও সেখানে ধর্মবিদ্বেষ ছড়ানোর বিরুদ্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট আইন আছে কিনা, বা থাকলেও তা কতটুকু কার্যকর, তা বোঝার উপায় নেই। গত বছরের ২৫ জানুয়ারী সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে একটি বিশেষ টিম গঠন করে বিটিআরসি। একই বছরের ২২ এপ্রিল থেকে

contact@csirt.gov.bdcontact@csirt.gov.bd

ঠিকানায় সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে পরামর্শ ও অভিযোগ গ্রহণ করা শুরু হয়। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে তারও কোনো কার্যকারিতা নেই।

বর্তমানে রাজীব হত্যার পর বিটিআরসির আবারও কিছু তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। দেশ ও জাতির সুরক্ষায় সরকার যদি এই চিহ্নিত নাস্তিক গোষ্ঠীর অপপ্রচার দমনে আন্তরিকভাবেই উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে, তবে তা হবে খুবই আশাব্যঞ্জক।

পরিশেষে তরুণ সমাজকে বলব, ইসলামবিদ্বেষী মহল দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছে এবং রাষ্ট্র ও সমাজকে ধর্মহীন করার জন্য সুকৌশলে দিবা-রাত্রি পরিশ্রম করে যাচ্ছে। এতদিন তারা আমাদেরকে সাংস্কৃতিক দেউলিয়াত্বের দিকে ঠেলে দেয়ার ষড়যন্ত্র চালিয়েছে। আজ তারা আর রাখ-ঢাক না করে সরাসরি মুসলিম জাতির মূল চেতনাকেন্দ্র পবিত্র কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে। সুতরাং আর অপেক্ষার সময় নেই। এদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য যেমন গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে, ঠিক তেমনি এদের হাত থেকে সমাজকে বাঁচানোর জন্য এবং নিজেদের আমল-আকীদা পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য ইসলাম সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জনের কোনো বিকল্প নেই। ব্লগ ও ফেসবুকে অপপ্রচারের খপ্পরে পড়ে অথবা কৌতুহলবশত আরজ আলী মাতুববর কিংবা হাল আমলের নাস্তিককুল শিরোমণি ক্রিস্টোফার হিচেন্স, রিচার্ড ডকিন্সদের বই-পত্র নাড়া-চাড়া করতে গিয়ে শিক্ষার্থী তরুণরা যেন বিভ্রান্তির শিকার না হয়, সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। সেই সাথে নাস্তিক্যবাদী ও মুখোশধারী কবি-সাহিত্যিকদের নষ্ট সাহিত্য অধ্যয়ন থেকে বিরত থাকতে হবে।

আর অভিভাবকদেরও দায়িত্ব হবে কোনোরূপ শিথিলতা না দেখিয়ে তাদের সন্তানদের শৈশব থেকেই ইসলামী চেতনায় সমুন্নত করা। যেন জীবনের উষালগ্নে তারা কোনোরূপ বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত না হয়। আল্লাহ আমাদেরকে এই নাস্তিকদের ষড়যন্ত্রকে রুখে দেওয়ার তাওফীক দান করুন এবং এদের কুটচাল থেকে এ দেশের মুসলিম সমাজকে হেফাযত করুন। আমীন। [ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত]

প্রশ্ন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন ক্রীতদাস হযরত যায়েদ রাযি.-এর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করলেন?

উত্তর : প্রথমে আমাদেরকে জেনে রাখা দরকার যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু করেছেন তার সবটাই ছিল আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী। তাই তাঁর কোনো কাজকে অস্বীকার করা বা প্রশ্নের সম্মুখীন করা সরাসরি আল্লাহর হুকুমকে চ্যালেঞ্জ করার শামিল। আল্লাহর সব কাজ সবার পক্ষে বোঝা সম্ভব না-ও হতে পারে; তাই বলে তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যাবে না। কেননা মুমিনদের কাজ হলো শোনা এবং মেনে নেয়া।

জাহেলীয়াতের সকল রেওয়াজকে ভেঙ্গে একটা ইনসাফপূর্ণ সমাজ কায়েম করার জন্যই আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছিলেন। সমাজের সকল ভ্রুকুটিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর সকল বিধানকে বাস্তব জীবনে আমল করে দেখিয়েছেন। দুনিয়ায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন হওয়ায় শয়তানের শরীরের আগুন লেগে গেছে। তাই শয়তানের চ্যালারা সেই নবুয়তী জমানা থেকে আজ পর্যন্ত শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নানান প্রশ্ন করে আসছে। তন্মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পালক পুত্র যায়েদ রাযি.-এর স্ত্রী যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ফুফাত বোনও ছিলেন; তার বিবাহ বিচ্ছেদের পর আল্লাহর হুকুমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক তাকে বিবাহ করা অন্যতম।

৫ম হিজরীর যিলক্বদ মাসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরব থেকে পালকপুত্র সংক্রান্ত জাহেলী রীতি নির্মূল করার জন্য নিজেই নিজের পালকপুত্রের তালাক দেয়া স্ত্রী হযরত জয়নব বিনতে জাহাশ রাযি.-কে বিয়ে করেন। এ সময় মদীনার মুনাফিকরা মিথ্যা অপপ্রচারের এক বিরাট তাণ্ডব সৃষ্টি করে। বাইর থেকে ইহুদি মুশরিকরাও তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে মিথ্যা অপবাদ রটাতে শুরু করে। তারা অদ্ভুত অদ্ভুত সব গল্প তৈরি করে চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে থাকে। যেমন– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে তার পালকপুত্রের স্ত্রীকে

দেখে তার প্রেমে পড়ে যান (নাউযুবিল্লাহ), কিভাবে পুত্র তার প্রেমের খবর পেয়ে যায় এবং তারপর নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তার ওপর থেকে নিজের অধিকার প্রত্যাহার করে এবং তারপর তিনি কিভাবে নিজের পুত্রবধূকে বিয়ে করেন!

এ গল্পগুলো এত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া হয় যে, কোনো কোনো মুসলমানও এগুলো থেকে প্রভাবমুক্ত থাকতে পারেনি। এ কারণে মুহাদ্দিস ও মুফারসিরদের একটি দল হযরত যয়নব ও যায়েদের সম্পর্কে যে হাদীস বর্ননা করেছেন সেগুলোর মধ্যে আজো ঐসব মনগড়া গল্পের অংশ পাওয়া যায়।

হযরত যয়নব রাযি. ছিলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আপন ফুফুর মেয়ে। তার শৈশবকাল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে অতিবাহিত হয়েছিল। অতএব তাকে ঘটনাক্রমে একদিন দেখে নেয়া এবং তার প্রেমে পড়ে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

কুরাইশদের শ্রেষ্ঠ অভিজাত পরিবারের মেয়ে একজন মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামের পত্নী হওয়াকে স্বাভাবিকভাবেই মেনে না নেওয়ার কথা। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার সূচনা নিজের পরিবার থেকে শুরু করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি হযরত যয়নব রাযি. এ বিয়েতে রাজী করেন। এসব কথা বন্ধু-শত্রু সবাই জানত। আর একথাও সবাই জানত, হযরত যয়নবের বংশীয় আভিজাত্যবোধই তার ও যায়েদ ইবনে হারেসার মধ্যকার দাম্পত্য সম্পর্ক স্থায়ী হতে দেয়নি এবং শেষ পর্যন্ত তা তালাকের রূপ ধারণ করে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও নির্লজ্জ মিথ্যা অপবাদকারীরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এ ব্যাপারে দোষারোপ করে এবং এত ব্যাপক আকারে সেগুলো ছড়ায় যে, আজও পর্যন্ত তাদের এ মিথ্যা প্রচারণার প্রভাব দেখা যায়।

বিষয়টি সম্পর্কে সূরা সূরা আহযাবের ৩৭ নং আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে– আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন; আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন; তাকে যখন আপনি বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে

ভয় কর। আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ তাআলা প্রকাশ করে দেবেন আপনি লোকনিন্দার ভয় করেছিলেন অথচ আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত। অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোনো অসুবিধা না থাকে। আল্লাহর নির্দেশ কার্যে পরিণত হয়েই থাকে।

এখান থেকে ৪৮নং আয়াত পর্যন্ত বিষয়বস্তু এমন সময় নাযিল হয় যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত যয়নব রাযি.-কে বিয়ে করে ফেলেছিলেন এবং একে ভিত্তি করে মুনাফিক, ইহুদি ও মুশরিকরা রাসূলের বিরুদ্ধে তুমুল অপপ্রচার শুরু করে দিয়েছিল।

এ আয়াতগুলো অধ্যায়ন করার সময় একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, শত্রুরা যারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে ইচ্ছা করেই দুর্নাম রটাবার এবং নিজেদের অন্তরজ্বালা মিটাবার জন্য মিথ্যা অপবাদ, গালমন্দ ও নিন্দাবাদের অভিযান চালাচ্ছিল তাদেরকে বুঝাবার উদ্দেশ্যে এগুলো বলা হয়নি। বরং এর আসল উদ্দেশ্য ছিল তাদের এ অভিযানের প্রভাব থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করা এবং ছড়ানো সন্দেহ-সংশয় থেকে তাদেরকে সংরক্ষিত রাখা।

'আল্লাহ তাআলা যাকে অনুগ্রহ করেছেন; আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন'- এখানে যায়েদের রাযি. কথা বলা হয়েছে। সামনের দিকে কথাটি সুস্পষ্ট করে প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁর প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ কী ছিল এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুগ্রহ কী ছিল সে কাহিনীটি বর্ণনা করে দেয়া জরুরি মনে করছি।

হযরত যায়েদ রাযি. ছিলেন কালব গোত্রের হারেসা ইবনে শারাহীল নামক এক ব্যক্তির পুত্র। তাঁর মাতা সুদা বিনতে সালাব ছিলেন তাঈ গোত্রের বনী মান শাখার মেয়ে। হযরত যায়েদ রাযি.-এর বয়স যখন আট বছর তখন তাঁর মা তাঁকে নিয়ে পিতার বাড়ি চলে যান। সেখানে বনী কাইন ইবনে জাসকরের লোকেরা তাদের লোকালয় আক্রমণ করে এবং লুটপাট করে যেসব লোককে নিজেদের সাথে পাকড়াও করে নিয়ে যায়

তাদের মধ্যে হযরত যায়েদও ছিলেন। তারা তায়েফের নিকটবর্তী উকাযের মেলায় নিয়ে গিয়ে তাঁকে বিক্রি করে দেয়।

হযরত খাদীজা রাযি.-এর ভাতিজা হাকীম ইবনে হিযাম তাঁকে কিনে নিয়ে যান। তিনি তাঁকে মক্কায় নিয়ে এসে নিজের ফুফুর খেদমতে উপঢৌকন হিসেবে পেশ করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হযরত খাদীজা রাযি.-এর যখন বিয়ে হয় তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাছে যায়েদকে দেখেন এবং তার চালচলন ও আদব কায়দা তার এত বেশি পছন্দ হয়ে যায় যে, তিনি হযরত খাদীজার রাযি.-এর কাছ থেকে তাকে চেয়ে নেন। এভাবে এই সৌভাগ্যবান ছেলেটি সৃষ্টির সেরা এমন এক ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে যান যাকে কয়েক বছর পরেই মহান আল্লাহ নবীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে যাচ্ছিলেন। তখন হযরত যায়েদ রাযি.-এর বয়স ছিল ১৫ বছর।

কিছুকাল পর তার বাবা-চাচা জানতে পারেন যে, তাদের ছেলে মক্কায় আছে। তারা তার খোঁজ করতে করতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছে যায়। তারা বলেন, আপনি মুক্তিপণ হিসেবে যা নিতে চান বলুন আমরা তা আপনাকে দিতে প্রস্তুত আছি, আপনি আমাদের সন্তান আমাদের হাতে ফিরিয়ে দিন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি আপনাদের ছেলেকে ডেকে আনছি এবং এ বিষয়টি তার ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। সে চাইলে আপনাদের সাথে চলে যেতে পারে এবং চাইলে আমার কাছেও থাকতে পারে। যদি সে আপনাদের সাথে চলে যেতে চায় তাহলে আমি এর বিনিময়ে মুক্তি পণ হিসেবে কোনো অর্থ নেব না এবং তাকে এমনিই ছেড়ে দেব। আর যদি সে আমার কাছে থাকতে চায় তাহলে আমি এমন লোক নই যে, কেউ আমার কাছে থাকতে চাইলে আমি তাকে খামাখা তাড়িয়ে দেব।

জবাবে তারা বলল, আপনি যে কথা বলেছেন তা তো ইনসাফেরও অতিরিক্ত। আপনি ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞেস করে নিন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়েদকে ডেকে আনেন এবং তাকে বলেন, এই দু'জন ভদ্রলোককে চেন?

যায়েদ রাযি. জবাব দেন, জি হ্যাঁ, উনি আমার পিতা এবং উনি আমার চাচা। তিনি বলেন, আচ্ছা, তুমি এদেরকেও জান এবং আমাকেও জান।

আমি তোমাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিচ্ছি, তুমি চাইলে এদের সাথে চলে যেতে পার এবং চাইলে আমার সাথেও থেকে যেতে পার।

হযরত যায়েদ রাযি. একথা শুনে বললেন, আমি আপনাকে ছেড়ে কারো কাছে যেতে চাই না।

এবার হযরত যায়েদ রাযি. এর পিতা ও চাচা বলল, যায়েদ! তুমি কি স্বাধীনতার ওপর দাসত্বকে প্রাধান্য দিচ্ছ? এবং নিজের মা-বাপ ও পরিবার-পরিজনকে ছেড়ে অন্যদের কাছে থাকতে চাচ্ছ?

তিনি জবাব দিলেন, আমি এ ব্যক্তির যে গুণাবলী দেখেছি তার অভিজ্ঞতা লাভ করার পর এখন আর দুনিয়ার কাউকেও তার ওপর প্রাধান্য দিতে পারি না।

হযরত যায়েদ রাযি.-এর এ জবাব শুনে তার পিতা ও চাচা সন্তুষ্টচিত্তে তাকে রেখে যেতে রাজি হয়ে যান। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনই যায়েদকে আযাদ করে দেন এবং হারাম শরীফে গিয়ে কুরাইশদের সাধারণ সমাবেশে ঘোষণা করেন, আপনারা সবাই সাক্ষী থাকেন আজ থেকে যায়েদ আমার ছেলে, সে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং আমি তার উত্তরাধিকারী হবো। এ কারণে লোকেরা তাঁকে যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ বলতে থাকে। এটা হলো নবুওয়াতের পূর্বের ঘটনা।

তারপর যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুওয়াতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন, তখন চারজন লোক এমন ছিলেন, যারা এক মুহূর্তের জন্যও কোনো প্রকার সন্দেহ ছাড়া তাঁর মুখে নবুওয়াতের দাবী শুনতেই তাকে নবী বলে মেনে নেন। তাদের একজন হযরত খাদীজা রাযি., দ্বিতীয়জন হযরত যায়েদ রাযি., তৃতীয় জন হযরত আলী রাযি. এবং চতুর্থজন হযরত আবু বকর রাযি.। এ সময় হযরত যায়েদ রাযি.-এর বয়স ছিল ৩০ বছর এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে তার ১৫ বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল।

৪র্থ হিজরীতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ফুফাত বোনকে হযরত যায়েদের সাথে বিয়ে দেন। নিজের পক্ষ থেকে তার মোহরানা আদায় করেন এবং ঘর-সংসার গুছিয়ে নেবার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও দেন। এ অবস্থার প্রতিই মহান আল্লাহ

তাআলা ইশারা করে বলেছেন– 'যার প্রতি আল্লাহ তাআলা ও তুমি অনুগ্রহ করেছিলে'।

'তাকে যখন আপনি বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর'–এটা সে সময়ের কথা, যখন হযরত যায়েদ রাযি. ও হযরত যয়নব রাযি.-এর সম্পর্ক তিক্ততার চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল এবং তিনি বারবার অভিযোগ করার পর শেষ পর্যন্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে নিবেদন করেন, আমি তাকে তালাক দিতে চাই। হযরত যয়নব রাযি. যদিও আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের হুকুম মেনে নিয়ে তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যান কিন্তু নিজের মন থেকে এ অনুভূতিটি তিনি কখনো মুছে ফেলতে পারেননি যে, যায়েদ একজন মুক্তিপ্রাপ্ত দাস, তাদের নিজেদের পরিবারের অনুগ্রহে লালিত এবং তিনি নিজে আরবের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও এ ধরনের একজন নিম্নমানের লোকের সাথে তার বিয়ে দেয়া হয়েছে। এ অনুভূতির কারণে দাম্পত্য জীবনে তিনি কখনো হযরত যায়েদকে নিজের সমকক্ষ ভাবেননি। এ কারণে উভয়ের মধ্যে তিক্ততা বেড়ে যেতে থাকে। এক বছরের কিছু বেশি দিন অতিবাহিত হতে না হতেই অবস্থা তালাকের পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

'আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ তাআলা প্রকাশ করে দেবেন। আপনি লোকনিন্দার ভয় করেছিলেন অথচ আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত।'

কেউ কেউ এই আয়াতের উল্টো অর্থ গ্রহণ করেছেন এভাবে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই হযরত যয়নব রাযি.-কে বিয়ে করতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং তাঁর মন চাচ্ছিল হযরত যায়েদ তাকে তালাক দিয়ে দিক। কিন্তু যখন যায়েদ রাযি. এসে বললেন, আমি স্ত্রীকে তালাক দিতে চাই, তখন তিনি আসল কথা মনের মধ্যে চেপে রেখে কেবল মুখেই তাকে নিষেধ করলেন। একথায় আল্লাহ তাআলা বলছেন, আপনি মনের মধ্যে যে কথা লুকিয়ে রাখছিলেন, আল্লাহ তাআলা তা প্রকাশ করতে চাচ্ছিলেন।

অথচ আসল ব্যাপারটা এর সম্পূর্ণ উল্টো। যদি এ সূরার ১, ২, ৩, ও ৭নং আয়াতের সাথে এ বাক্যটি মিলিয়ে পড়া হয়, তাহলে পরিস্কার

অনুভুত হবে যে, হযরত যায়েদ ও তার স্ত্রীর মধ্যে যে সময় তিক্ততা বেড়ে যাচ্ছিল সে সময়ই আল্লাহ্ তাআলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এ মর্মে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, যায়েদ যখন তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিবে, তখন আপনি তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করবেন। কিন্তু যেহেতু আরবের সে সমাজে পালকপুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করার অর্থ কি তা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন এবং তাও এমন এক অবস্থায় যখন মুষ্টিমেয় কিছু মুসলমান ছাড়া বাকি সমগ্র আরব দেশ তাঁর বিরুদ্ধে ধনুকভাঙাপণ করে বসেছিল।

এ অবস্থায় তিনি এ কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে ইতস্তত করছিলেন। এ কারণে হযরত যায়েদ রাযি. যখন আপন স্ত্রীকে তালাক দেবার সংকল্প প্রকাশ করেন, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ো না। তার উদ্দেশ্য ছিল, যায়েদ যদি তালাক না দেন, তাহলে তিনি এ বিপদের মুখোমুখী হওয়া থেকে বেঁচে যাবেন। নয়তো যায়েদ তালাক দিলেই তাকে হুকুম পালন করতে হবে এবং তারপর তাঁর বিরুদ্ধে খিস্তি-খেউড় ও অপপ্রচারের ভয়াবহ তুফান সৃষ্টি করা হবে। কিন্তু মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে উচ্চ মনোবল, দৃঢ় সংকল্প ও আল্লাহর ফায়সালায় রাজি থাকার যে উচ্চমর্যাদার আসনে দেখতে চাচ্ছিলেন সে দৃষ্টিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইচ্ছা করে যায়েদকে তালাক থেকে বিরত রাখা নিম্নমানের কাজ বিবেচিত হয়। তিনি আসলে ভাবছিলেন যে, এর ফলে তিনি এমন কাজ করা থেকে বেঁচে যাবেন যাতে তাঁর দুর্নামের আশংকা ছিল। অথচ আল্লাহ্ তাআলা একটি বড় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁকে দিয়ে সে কাজটি করাতে চাচ্ছিলেন। তুমি লোকনিন্দার ভয় করছ অথচ আল্লাহকে ভয় করাই অধিকতর সংগত'– এ কথাগুলো পরিষ্কারভাবে এ বিষয়বস্তুর দিকেই ইঙ্গিত বহন করছে।

আল্লামা আলুসী রহ.ও তাফসীরে রুহুল মাআনীতে এর একই অর্থ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এটি হচ্ছে শ্রেয়তর কাজ পরিত্যাগ করার জন্য ক্রোধ প্রকাশ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি চুপ থাকতেন অথবা যায়েদ রাযি.-কে বলতেন, তুমি যা চাও করতে পার, এ অবস্থায় এটিই ছিল শ্রেয়তর। কিন্তু তা না করায় আল্লাহ তাআলা ক্রোধ

প্রকাশ করে বলেছেন– 'তুমি কেন যায়েদকে বললে তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করো না। অথচ আমি তোমাকে আগেই জানিয়ে দিয়েছি যে, যয়নব তোমার স্ত্রীদের মধ্যে শামিল হবে।'

[অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোনো অসুবিধা না থাকে]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই নিজের ইচ্ছায় এ বিয়ে করেননি বরং আল্লাহর হুকুমের ভিত্তিতে করেন, এ ব্যাপারে এ শব্দগুলো একবারেই সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। এ শব্দগুলো একথা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে যে, আল্লাহ তাআলা এ কাজ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে এমন একটি প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য করিয়েছিলেন যা এ পদ্ধতিতে ছাড়া অন্য কোনোভাবে সম্পাদিত হতে পারতো না। আরবে পালকপুত্র সম্পর্কিত আত্মীয়তার ব্যাপারে যে সমস্ত ভ্রান্ত রসম-রেওয়াজের প্রচলন হয়ে গিয়েছিল আল্লাহর রাসূল নিজে অগ্রসর হয়ে না ভাঙলে সেগুলো ভেঙে ফেলার ও উচ্ছেদ করার আর কোনো পথ ছিল না। কাজেই আল্লাহ তাআলা নিছক নবীর গৃহে আর একজন স্ত্রী বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে নয় বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য এ বিয়ে করিয়েছিলেন।

প্রশ্ন : সূর্য কি পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে?

উত্তর : শরীয়তের প্রকাশ্য দলীলগুলো প্রমাণ করে যে, সূর্যই পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরে। এই ঘুরার কারণেই পৃথিবীতে দিবা-রাত্রির আগমণ ঘটে। আমাদের হাতে এই দলীলগুলোর চেয়ে বেশি শক্তিশালী এমন কোনো দলীল নেই, যার মাধ্যমে আমরা সূর্য ঘূরার দলীলগুলোকে ব্যাখ্যা করতে পারি। সূর্য ঘুরার দলীলগুলো হলো–

১. আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহ তাআলা সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন। তুমি পারলে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর। [সূরা বাকারা : ২৫৮]

সূর্য পূর্ব দিক থেকে উঠার মাধ্যমে প্রকাশ্য দলীল পাওয়া যায় যে, সূর্য পৃথিবীর ওপর পরিভ্রমণ করে।

২. আল্লাহ বলেন, অতঃপর যখন (ইবরাহীম আ.) সূর্যকে চকচকে অবস্থায় উঠতে দেখলেন তখন বললেন, এটি আমার পালনকর্তা, এটি বৃহত্তর। অতঃপর যখন তা ডুবে গেল, তখন বলল হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যেসব বিষয়ে শরীক কর আমি ওসব থেকে মুক্ত। [সূরা আনআম : ৭৮] এখানে নির্ধারণ হয়ে গেল যে, সূর্য অদৃশ্য হয়ে যায়। একথা বলা হয়নি যে, সূর্য থেকে পৃথিবী ডুবে গেল। পৃথিবী যদি ঘূরত তাহলে অবশ্যই তা বলা হত।

৩. আল্লাহ বলেন, তুমি সূর্যকে দেখবে, যখন উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে পাশ কেটে ডান দিকে চলে যায় এবং যখন অস্ত যায়, তাদের থেকে পাশ কেটে বাম দিকে চলে যায়। [সূরা কাহাফ : ১৭]

পাশ কেটে ডান দিকে বা বাম দিকে চলে যাওয়া প্রমাণ করে যে, নড়াচড়া সূর্য থেকেই হয়ে থাকে। পৃথিবী যদি নড়াচড়া করত তাহলে অবশ্যই বলতেন সূর্য থেকে গুহা পাশ কেটে যায়। উদয় হওয়া এবং অস্ত যাওয়াকে সূর্যের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এটা থেকে বুঝা যায় যে, সূর্যই ঘুরে। পৃথিবী নয়।

৪. আল্লাহ বলেন, এবং তিনিই দিবা-নিশি এবং চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টি করেছেন। সবাই আপন আপন কক্ষ পথে বিচরণ করে। [সূরা আম্বিয়া : ৩৩]

ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, লাটিম যেমন তার কেন্দ্র বিন্দুর চার দিকে ঘুরতে থাকে, সূর্যও তেমনিভাবে ঘুরে।

৫. আল্লাহ বলেন, তিনি রাতকে আচ্ছাদিত করেন দিনের মাধ্যমে, দিন দৌড়ে দৌড়ে রাতের পিছনে আসে। [সূরা আরাফ : ৫৪]

উক্ত আয়াতে রাতকে দিনের অনুসন্ধানকারী বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অনুসন্ধানকারী পিছনে পিছনে দ্রুত অনুসন্ধান করে থাকে। এটা জানা কথা যে, দিবা-রাত্রি সূর্যের অনুসারী।

৬. আল্লাহ তাআলা বলেন, তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি রাত্রিকে দিবস দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং

দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিযুক্ত করেছেন। প্রত্যেকেই বিচরণ করে নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত জেনে রাখুন, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। [সূরা যুমার : ৫]

এ আয়াতের মাধ্যমে আমরা জানলাম যে, পৃথিবীর ওপরে দিবা-রাত্রি চলমান রয়েছে। পৃথিবী যদি ঘুরত তাহলে তিনি বলতেন, দিবা-রাত্রির ওপর পৃথিবীকে ঘুরান। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, সূর্য এবং চন্দ্রের প্রত্যেকেই চলমান। এই সমস্ত দলীলের মাধ্যমে জানা গেল যে, সুস্পষ্টভাবেই সূর্য ও চন্দ্র এক স্থান থেকে অন্য স্থান চলাচল করছে। এ কথা সুস্পষ্ট যে, চলমান বস্তুকে বশীভুত করা এবং কাজে লাগানো একস্থানে অবস্থানকারী বস্তুকে কাজে লাগানোর চেয়ে অধিক যুক্তিসঙ্গত।

৭. মহান আল্লাহ্ বলেন, সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র নির্ধারণ। চন্দ্রের জন্যে আমি বিভিন্ন মনযিল নির্ধারিত করেছি। অবশেষে সে পুরাতন খর্জুর শাখার অনুরূপ হয়ে যায়। সূর্যের পক্ষে চন্দ্রকে নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। রাতের পক্ষেও দিনের অগ্রবতী হওয়া সম্ভব নয়। প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে। [সূরা ইয়াসীন : ৩৮-৪০]

সূর্যের চলা এবং এই চলাকে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্র নির্ধারণ বলে ব্যাখ্যা করা এটাই প্রমাণ করে যে, সূর্য প্রকৃতভাবেই চলমান। আর এই চলাচলের কারণেই দিবা-রাত্রি এবং ঋতুর পরিবর্তন হয়। চন্দ্রের জন্য মনযিল নির্ধারণ করার অর্থ এই যে, সে তার মনযিলসমূহে স্থানান্তরিত হয়। যদি পৃথিবী ঘুরত, তাহলে পৃথিবীর জন্য মনযিল নির্ধারণ করা হত। চন্দ্রের জন্য নয়। সূর্য কর্তৃক চন্দ্রকে ধরতে না পারা এবং দিনের অগ্রে রাত থাকা সূর্য, চন্দ্র, দিন এবং রাতের চলাচলের প্রমাণ বহন করে।

৮. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় আবু যর রাযি.-কে বলেছেন—হে আবু যর! তুমি কি জান সূর্য যখন অস্ত যায় তখন কোথায় যায়? আবু যর রাযি. বললেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় আরশের নীচে গিয়ে

সেজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং পুনরায় উদিত হওয়ার অনুমতি চায়। অতঃপর তাকে অনুমতি দেয়া হয়। সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন অনুমতি চাবে কিন্তু তাকে অনুমতি দেয়া হবে না। তাকে বলা হবে যেখান থেকে এসেছ, সেখানে ফেরত যাও। অতঃপর সূর্য পশ্চিম দিক থেকেই উদিত হবে। এটি হবে কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে।

আল্লাহ্ সূর্যকে বলবেন, যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফেরত যাও, অতঃপর সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, সূর্য পৃথিবীর উপরে ঘুরছে এবং তার এই ঘুরার মাধ্যমেই উদয়-অস্ত সংঘটিত হচ্ছে।

অসংখ্য হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় যে, উদয় হওয়া, অস্ত যাওয়া এবং ঢলে যাওয়া এই কাজগুলো সূর্যের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলো সূর্য থেকে প্রকাশিত হওয়া খুবই সুস্পষ্ট। পৃথিবী হতে নয়। [ফতোওয়া আরকানুল ইসলাম :আল্লামা উসাইমীন রহ.]

প্রশ্ন : বর্তমানে ডাক্তারগণ মাতৃগর্ভে পুত্রসন্তান আছে, না কন্যা সন্তান আছে– বলে দিতে পারেন। অথচ পবিত্র কুরআনের এক আয়াতে আছে, মাতৃগর্ভে কী আছে তা আল্লাহ তাআলাই জানেন। এর সমাধান কি?

উত্তর : প্রথমেই জেনে রাখা ভালো যে, কুরআনের কোনো আয়াত কখনোই বাস্তবতা বিরোধী হতে পারে না। যদি কখনো বাহ্যত এরকম কিছু দেখা যায়, তবে হয়তো এটা নিছক অবাস্তব দাবি অথবা এমন হবে যে, কুরআনের আয়াতটি সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট নয়। কেননা কুরআনের প্রকাশ্য আয়াত এবং প্রকৃত বাস্তব ঘটনা উভয়টিই অকাট্য। আর দু'টি অকাট্য বিষয়ের মধ্যে কখনো বিরোধ হতে পারে না।

বর্তমানে ডাক্তারগণ ছেলেসন্তান বা মেয়েসন্তান হওয়া সম্পর্কে যে আগাম খবর প্রদান করেন, তার সাথে আয়াতের কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কারণ আয়াতটিতে পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যা আল্লাহর জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত। তন্মধ্যে মাতৃগর্ভে কী আছে তা একটি। শিশুর মাতৃগর্ভে থাকাবস্থায় গায়েবী বিষয়গুলো হলো– সে কতদিন মায়ের পেটে থাকবে, কতদিন দুনিয়াতে বেঁচে থাকবে, কীরকম আমল করবে, কতটুকু রিযিক

গ্রহণ করবে, সৌভাগ্যবান হবে না দুর্ভাগ্যবান হবে, গঠন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ছেলে হবে না মেয়ে হবে ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হওয়া। আর গঠন পূর্ণ হওয়ার পর মাতৃগর্ভে ছেলে না মেয়ে এ সম্পর্কে অবগত হওয়া ইলমে গায়েবের অন্তর্ভূক্ত নয়। কেননা গঠন পূর্ণ হওয়ার পর বিষয়টির জ্ঞান প্রত্যক্ষ বিষয়ের জ্ঞানের মতই হয়ে গেল। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, শিশুটি তিনটি অন্ধকারের ভিতর লুকায়িত আছে। যদি অন্ধকারের আবরণগুলো অপসারণ করা হয়, তাহলে বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যাবে। এটা অসম্ভব নয় যে, আল্লাহর সৃষ্টিসমূহের মধ্যে এমন শক্তিশালী যন্ত্র রয়েছে, যা এই তিনটি অন্ধকার ভেদ করতে সক্ষম। যার মাধ্যমে শিশুটি ছেলে না মেয়ে– জানা যাবে।

তাছাড়া আয়াতে মাতৃগর্ভে ছেলেসন্তান বা মেয়েসন্তান হওয়ার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই জানেন, অন্য কেউ জানে না– একথা বলা হয়নি। হাদীসেও এ মর্মে কোনো সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নেই।

আল্লামা ইবনে কাছীর রহ. আয়াতের তাফসীরে বলেন, মাতৃগর্ভে যা আছে তা দিয়ে আল্লাহ্ তাআলা কী সৃষ্টি করতে চান, তা তিনি ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। কিন্তু যখন ছেলে বা মেয়ে হওয়ার কিংবা সৌভাগ্যবান বা দুর্ভাগ্যবান হওয়ার আদেশ দিয়ে দেন, তখন ফেরেশতাগণ এবং অন্যান্য সৃষ্টি জীবও জানে।

প্রশ্ন : ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তলোয়ারের মাধ্যমে আর মুসলমানরা অসহিষ্ণু– বাস্তবতা কতটুকু?

অনেক সামাজিক গ্রন্থে যে দৃশ্যটি দেখানো হয় তা হলো, একজন ঘোড় সোওয়ার। যার এক হাতে রয়েছে উন্মুক্ত তলোয়ার আর এক হাতে কুরআন। সে জোর করে মানুষকে ইসলামে দিক্ষিত করার জন্য যুদ্ধে ছুটে যাচ্ছে। মূলতঃ এ দৃশ্যটি ইসলামের প্রকৃত রূপ নয়। ইসলাম সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টির জন্য এ জাতীয় একটি কল্পিত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

ইসলাম কখনো অন্য কোনো ধর্মাবলম্বীকে জোর করে ধর্মান্তরিত করতে বলেনি। বরং সকল ধর্মকে সম্মান করতে শিক্ষা দিয়েছে। সকল ধর্মাবলম্বীদেরকে প্রদান করেছে ধর্ম গ্রহণের স্বাধীনতা। আল্লাহ্ তাআলা

বলেন, দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিস্কার করেনি তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ্ তো ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন। [সূরা মুমতাহিনা : ৮]

ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ইসলাম সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা সুস্পষ্টভাবে বলেন, দীনের ক্ষেত্রে জোর-জবরদস্তি চলবে না। হেদায়াত এবং গোমরাহী স্পষ্ট হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি 'তাগুত' কে অস্বীকার করল সে এমন 'মজবুত হাতল' ধরল যা কখনো বিচ্ছিন্ন হবার নয়। আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন; সব কিছু জানেন। [সূরা বাকারা : ২৫৬]

বিশিষ্ট খ্রিস্টান মিশনারী টমাস ওয়ারনোল্ড ইসলামের প্রসার সংক্রান্ত এক গবেষণায় বলেন, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরকে জোর করে ইসলামে দিক্ষীত করার কোনো পরিকল্পিত চেষ্টা কখনো হয়েছে কিংবা খ্রিস্টান ধর্মকে সমূলে উৎখাতের জন্য সংগঠিতভাবে কোনো যুলম-নির্যাতন পরিচালিত হয়েছে বলে আমরা শুনিনি। মুসলিম খলীফাগণ যদি উক্ত দু'টি পরিকল্পনার কোনো একটি বাস্তবায়ন করতেন তবে এত সহজে খ্রিস্টানদেরকে মূলৎপাটিত করতে সক্ষম হতেন যেভাবে রাজা ফার্ডিনেন্ড এবং রানী ইসাবেলা ইসলামকে স্পেনের মাটি থেকে উৎখাত করেছিল।

ইসলামী সমাজে বসবাসরত সংখ্যালঘু সমপ্রদায়কে রক্ষা করা ইসলামের অন্যতম একটি দায়িত্ব। যার প্রকিষ্ঠ উদাহরণ হলো, ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, বিভিন্ন মুসলিম দেশে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয়গুলোকে সংরক্ষিত অবস্থায় রাখা হয়েছিল এবং আজ পর্যন্ত রয়েছে।

মূলতঃ ধর্মীয় সহিঞ্চুতার ঘটনায় ইসলামের ইতিহাস পরিপূর্ণ। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. ৬৩৪ হিজরীতে বিজয়ী বেশে যখন বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করলেন তখন তিনি সেখানে অবস্থানরত প্রতিটি মানুষকে ধর্মীয় স্বাধীনতা দান করেছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারবে। আরো ঘোষণা করলেন, প্রতিটি মানুষের জান-মাল নিরাপদ এবং তাদের উপাসনালয়গুলোকে রক্ষা করার যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

অনুরূপভাবে ইসলামী আইনে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করা অনুমোদিত। যেখানে সংখ্যালঘুদের নিজস্ব আইন অনুযায়ী পারস্পারিক বিষয়াদীর নিষ্পত্তি করা হবে।

মোটকথা, ইসলামী রাষ্ট্রে প্রতিটি নাগরিকের জান-মালকে পবিত্র আমানত হিসেবে গণ্য করা হয়। চাই সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক। ইসলামে সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান নেই। কুরআন বলে, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নাই; সকল মানুষ সমান। ইরশাদ হচ্ছে–

হে মানুষগণ, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠিতে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মাঝে আল্লাহর নিকট সেই সবচেয়ে বেশি সম্মানিত যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহভীরু। [সূরা হুজুরাত : ৪৯]

প্রশ্ন : দীনি শিক্ষা অথবা অন্য কোনো শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোনো অবিবাহিতা যুবতী নারী মাহরাম ছাড়া নিজ এলাকা থেকে দূরে কোথাও গিয়ে পড়ালেখা করতে পারবে কি?

উত্তর : দীনী ইলম এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞান শিক্ষা করা মহিলাদের ওপরও জরুরি। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব যদি সফরের দূরত্ব পরিমাণ হয় এবং উক্ত শিক্ষার্থী মহিলার যদি মাহরাম থাকে, তাহলে দুই শর্তে মাহরাম ছাড়া অন্যত্র বসবাস করে শিক্ষা গ্রহণ বৈধ।

১. প্রতিষ্ঠানে গমন এবং প্রতিষ্ঠান থেকে বাড়িতে ফেরার সময় মাহরাম ব্যক্তি সাথে থাকতে হবে।
২. উক্ত প্রতিষ্ঠানে শরয়ী পর্দা পালন করার সুযোগ এবং পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা থাকতে হবে।

উক্ত দুই শর্তে মহিলাদের সফরের দূরত্বে থাকা প্রতিষ্ঠানে দীনী ইলম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণের জন্য অবস্থান করা জায়েয আছে।

হযরত আনাস বিন মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের ওপর দীনী ইলম শিক্ষা করা ফরজ। [সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং : ২২৪]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা এবং কিয়ামত দিবসের ওপর ঈমান রাখে এমন কোনো মহিলার জন্য জায়েয নয়, তিন দিন বা এর চেয়ে অধিক দিনের সফর করে অথচ তার সাথে তার পিতা বা তার ছেলে বা তার স্বামী বা তার ভাই কিংবা কোনো মাহরাম না থাকে। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৪২৩]

প্রশ্ন : ছবি আঁকা ও ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি?

জবাব : প্রয়োজন ছাড়া ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা জায়েয নয়। ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা আর ছবি আঁকার বিধান একই। উভয়টিই সম্পূর্ণ হারাম। কেননা, শরীয়তে যেই বিষয় মৌলিকভাবে জায়েয নয় তা করার যন্ত্র পাল্টে গেলেও তার হুকুম পাল্টে না। যেমন- মদ খাওয়া হারাম। হাতে মদ বানালে যেই হুকুম, মেশিনে বানালেও একই হুকুম। এমনিভাবে মানুষ হত্যা করা হারাম, হাতে হত্যা করা যেমন হারাম কোনো নব আবিস্কৃত যন্ত্রের মাধ্যমে হত্যা করলেও একই বিধান প্রযোজ্য। তবে কম্পিউটার ও মোবাইল স্ক্রীনে থাকা প্রাণীর (অশ্লীল ও নারীর ছবি ছাড়া) ছবি প্রিন্ট করার আগ পর্যন্ত জায়েয বলেছেন জামিয়া বিন্নুরিয়া পাকিস্তানের ফাতাওয়া বিভাগ।

কম্পিউটার স্ক্রীনে বা মোবাইল স্ক্রীনে ছবি না রাখাটাও তাক্বওয়ার দাবী। সুতরাং উলামায়ে কেরামসহ যারা সমাজের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব তাদের জন্য অবশ্যই কাজটি বর্জনীয়। যেন সাধারণ লোকজন ছবি তুলে প্রিন্ট করার মাধ্যমে সুস্পষ্ট হারাম কাজে লিপ্ত হতে উদ্বুদ্ধ না হয়।

[ফিক্বহী মাক্বালাত : ৪/১২৩-১৩০ # তাফসীরু আয়াতিল আহকাম : ২/৩০০ # জাদীদ ফিক্বহী মাসায়েল : ১/৩৫৪ # জাওয়াহীরুল ফিক্বহ : ৪/৯ # www.jamiabinoria.com]

প্রশ্ন : আমি একটি কলেজে চাকুরি করি। কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের এক সাথে পড়াতে হয়। পর্দা করা ইসলামের একটি জরুরি বিধান। এখন কলেজে চাকুরি করতে গেলে তো পর্দার খেলাফ হয়। আমার চাকুরির বয়স শেষ। তাছাড়া উপার্জনের জন্য আমার আর অন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। এই অবস্থায় আমি কী করতে পারি?

উত্তর : ইসলামে পর্দার বিধান নামাজ রোজার মতই জরুরি একটি বিধান। এটি লঙ্ঘন করা জায়েয নয়। তাই যদি শুধু ছাত্রদের পড়ানোর কোনো সুবিধা না করতে পারেন, তাহলে উক্ত চাকুরিটি ছেড়ে অন্যত্র চাকুরি খুঁজুন। হুট করেই চাকুরি ছেড়ে দিবেন না। বরং আগে ভালো করে চাকুরীর খোঁজ করুন। এরচেয়ে কম সুবিধার চাকুরি পেলেও এটি ছেড়ে দিন। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আপনার রিজিকে বরকত দিবেন।

ইরশাদ হয়েছে- আর তোমরা তাঁর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) স্ত্রীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাঁদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ। [সূরা আহযাব : ৫৩]

বিখ্যাত তাফসীরবিদ ইমাম কুরতুবী রহ. উক্ত আয়াতের আলোচনায় বলেন, উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের কাছে কোনো প্রয়োজনে পর্দার আড়াল থেকে কিছু চাওয়া বা কোনো মাসআলা জিজ্ঞেস করার অনুমতি দিয়েছেন। সাধারণ নারীরাও উপরোক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। [তাফসীরে কুরতুবী, ১৪/১৪৬]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণ হলেন সকল মুমিনের মা। অথচ তাঁদের সাথেই লেনদেন বা কথা-বার্তা বলতে হলে পর্দার আড়াল থেকে করতে বলা হয়েছে। তাহলে অন্যান্য সাধারণ বেগানা নারীদের ক্ষেত্রে হুকুমটি কত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত তা তো সহজেই অনুমেয়।

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর এবং উপার্জনে উত্তম পন্থা অবলম্বন করো। কেননা কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না, যতক্ষণ না তার রিযিক শেষ হয়। যদিও তা ধীরে ধীরে হয়। তাই আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো এবং উপার্জনে উত্তমপন্থা অবলম্বন কর। [সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং : ২১৪৪ # মুসনাদুল বায্যার, হাদীস নং : ২৯১৪]

প্রশ্ন : বৃক্ষরোপণ কি ইবাদত?

উত্তর : নিতান্তই অজ্ঞতা কিংবা ইসলামের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ যেসব ব্যক্তি ইসলামকে কেবল মসজিদ-মাদরাসার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ করতে পছন্দ করেন তাদের কাছে নিশ্চয়ই অভিনব মনে হবে যে, ইসলাম বৃক্ষ রোপণের ব্যাপারে সক্রিয় উৎসাহ প্রদান করে।

বাস্তবিক সত্য হলো, ইসলামকে আধুনিক জীবনবিধান না বলে উপায় নেই। পরিবেশ সংক্রান্ত অন্যান্য সমস্যা ছাড়াও গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ার ভয়াবহ ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে পরিবেশবিদরা যখন বিশ্বব্যাপী ব্যাপক বনায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করছেন তখন ইসলামের বাণী অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ করলে এ ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আশাব্যঞ্জক তথ্য পাওয়া যাবে।

ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ আধুনিক জীবন বিধান হিসেবে আখ্যা দেয়ার পেছনে অযৌক্তিক ধর্মীয় আবেগ জড়িত নয়, বরং এ ব্যাপারে বিজ্ঞানসম্মত ও বাস্তবোচিত প্রমাণ বিদ্যমান। কোনো ধর্মই বনায়নের ব্যাপারে সুদূরপ্রসারী চিন্তা করেছে বলে আমাদের জানা নেই। কিন্তু ইসলাম এ ব্যাপারে নীরব থাকেনি। বিশ্বব্যবস্থাকে চমৎকার পরিবেশের আওতায় শান্তিময় বাসযোগ্য করার দূরদর্শী পরিকল্পনা ইসলাম অতি যত্ন ও গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ইসলাম বৃক্ষরোপণের সুদূরপ্রসারী গুরুত্ব অনুধাবন করে তার অনুসারীদের এ ব্যাপারে তাগিদ প্রদান করেছে। বৃক্ষরোপণ তথা বনায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী আল্লাহর ইবাদতের সমতুল্য ঘোষণা করে ইসলাম যে শান্তির ধর্ম তা বাস্তবে রূপায়ণের চমৎকার চেষ্টা করা হয়েছে।

হাদীস শরীফে আছে, বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যদি কোনো মুসলমান একটি গাছের চারা লাগায় অথবা কোনো বীজ বপন করে, তারপর সেই গাছ ও ফসল দ্বারা কোনো মানুষ উপকৃত হয় কিংবা পশুপাখি তা ভক্ষণ করে, এর বিনিময়ে তার আমলনামায় সদকার সওয়াব লিখিত হয়।' [মুসলিম]

দুনিয়াতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই মুমিনের একমাত্র লক্ষ্য। বেশি বেশি গাছ লাগানোর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব। গাছ লাগানো আল্লাহর রাসূলেরও অতি পছন্দনীয় একটি কাজ ছিল। বৃক্ষ রোপণকারী ব্যক্তি বৃক্ষ থেকে সরাসরি উপকৃত লোকদের প্রকাশ্য দোয়া পেয়ে থাকেন।

একটি গাছ থেকে মানুষ, পশুপাখিসহ অন্যান্য প্রাণী ছাড়াও বিশ্বপরিবেশ বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়। কিছু উপকার সাধিত হয় প্রত্যক্ষ আবার কিছু পরোক্ষ। মোটকথা, এ পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখার পক্ষে বৃক্ষের দান অপরিসীম। বৃক্ষলতা ব্যতীত উষ্ণ মরুর বিশ্বে মানুষের বেঁচে থাকা নিতান্তই দায় হতো। দায় হতোই বা বলি কেন, রীতিমতো অসম্ভব হতো। সারা বিশ্বে পরিবেশ রক্ষায় ও তাপমাত্রা স্বাভাবিক রাখতে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। এর সম্মুখভাগে রয়েছে বনায়ন। পৃথিবীটাকে সবুজে ঘিরে রাখতে আমাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ইসলাম এ ব্যাপারে বিজ্ঞানসম্মত ও সময়োপযোগী দিকনির্দেশনা দিয়ে মানবজাতি তথা প্রাণীজগতের বসবাস অনুকূল পৃথিবীর গড়ার উৎকৃষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। শুধু রোপণ কিংবা বপনই নয়, বরং তা রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়েও ইসলাম গুরুত্ব দিতে ভুল করেনি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমরা যদি দুনিয়াতে একটি ফলবান বৃক্ষ রোপণ করে উহার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ করো, তাহলে তোমাদের দ্বারা জান্নাতে একটি ফলবান বৃক্ষ রোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণের সমতুল্য হবে।'

হাদীসের এ বক্তব্য কোনো সাধারণ ব্যাপার নয়। অসাধারণ দূরদর্শী দায়িত্ববোধ থেকে বনায়নের এ অপরিহার্য চিন্তা হাদীসে হয়েছে। দুনিয়াতে একটি গাছ লাগিয়ে তার যথার্থ পরিচর্যার বিপরীতে পরকালে বেহেশতের মধ্যে অনুরূপ একটি গাছের নিশ্চয়তা পাওয়া মুমিনের জন্য অনেক সৌভাগ্যের সন্দেহ নেই।

একটি গাছ প্রাণীর জন্য অপরিহার্য অতি মূল্যবান অক্সিজেন সরবরাহ করে। একই সাথে আমরা নিঃশ্বাসের সাথে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করি তা গাছ গ্রহণ করে পরিবেশের উষ্ণতা রোধে সহায়তা করে। প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে থাকা বৃক্ষের সারি ঝড়ঝাপ্টা থেকে জনপদকে রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ভূমি ক্ষয় রোধে সহায়তার মাধ্যমে বৃক্ষ ভৌগোলিক ভারসাম্য বজায় রাখতে ভূমিকা পালন করে। বৃক্ষরাজি পাখপাখালির খাদ্য সরবরাহ করে তাদের বেঁচে থাকার ও একই সাথে বসবাসের অবলম্বন হিসেবেও দায়িত্ব পালন করে। এ ছাড়া গাছ মানুষের

জন্য সরাসরি খাদ্য ও ওষুধ সরবরাহ, আসবাবপত্র তৈরির মূল্যবান উপকরণের যোগানও দিয়ে থাকে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন, একটি বড় গাছ তার জীবদ্দশায় মানুষ, পশুপাখিসহ পরিবেশের জন্য যে উপকার করে তার আনুমানিক অর্থমূল্য প্রায় ৫০ লাখ টাকা।

বর্তমানে সারাদেশে ভয়াবহ বন্যা জনগণকে নিদারুণ দুর্ভোগের শিকারে পরিণত করেছে। প্রতি বছরই কোনো না কোনো এলাকায় বন্যার উপদ্রব কয়েক বছর ধরে আমরা লক্ষ করছি। কয়েক বছর পরপর দেশব্যাপী বন্যা দেখা দিচ্ছে। পৃথিবীর কোনো কোনো অঞ্চলে তো সারা বছরই বন্যা হতে দেখা যায়। ক্রমেই বন্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এটি আবহাওয়ার একটি সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হতে বসেছে বলেই মনে হয়। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে এটি ঘটেছে। এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর অনেক জনপদ স্থায়ীভাবে পানিতে তলিয়ে যাবে। আমাদের বাংলাদেশেরও কয়েকটি উপকূলীয় অঞ্চল এ তালিকাভুক্ত। অধিক পরিমাণ গাছ লাগিয়ে গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি রোধ সম্ভব এবং এর দ্বারা বন্যার ক্রমাগত আক্রমণ থেকে জনপদ রক্ষা করা যেতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা আশাবাদ ব্যক্ত করছেন।

গাছ মুসলমানদের সদকায়ে জারিয়ার অন্যতম উপকরণ। মুসলমানরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, মৃত্যুই মানুষের জীবনের চূড়ান্ত সমাপ্তি নয়। মৃত্যুর পরও অনন্ত একটা সময় মানুষকে পার করতে হবে। ইসলাম ঘোষণা করেছে, মৃত্যুর মাধ্যমে একজন মুসলমান আপাতত কর্মদক্ষতা হারালেও ভালোমন্দের প্রতিফল তিনি অব্যহত রাখতে পারেন, যদি তিনি দুনিয়াতে কোনো উপযুক্ত অবলম্বন অবশিষ্ট রেখে যান। একে বলা হয় সদকায়ে জারিয়া। নেক সন্তানসহ অন্যান্য পুণ্যময় স্থাপনার মতো গাছও সদকায়ে জারিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন। কেউ একটি গাছ লাগিয়ে যথাযথ পরিচর্যার মাধ্যমে তাকে পরিণত করে গেলে তা থেকে মানুষ, পশুপাখি, পরিবেশ যে উপকার ভোগ করে তার সাওয়াব ওই ব্যক্তি মৃত্যুর পরও পেতে থাকবেন। বেশি বেশি গাছ লাগানোর মাধ্যমে কোনো মুসলমান মৃত্যুর পরও তার আমলনামা সমৃদ্ধ করার অপূর্ব সুযোগ পেতে পারেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে বৃক্ষরোপণের এই মহান ইবাদতে শরীক হওয়ার তাওফীক দান করুন।

....

পাঠকের মতামত

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমার প্রাণপ্রিয় শ্রদ্ধাভাজন লেখক! আমি ছোটবেলা থেকেই ইসলামী বই-পুস্তক পড়তে অভ্যস্ত। জীবনে আমি অনেক বই পড়েছি। কিন্তু হৃদয় গলে সিরিজের মতো মনোমুগ্ধকর, আকর্ষণীয় ও ঈমানী চেতনা জাগ্রতকারী বই খুব কমই পড়েছি। সত্যি বলতে কি, হৃদয় গলে সিরিজ আমার মত শত শত মানুষের হৃদয়কে মোমের মতো গলিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। এই সিরিজের আবির্ভাব ঠিক তখনই হয়েছে যখন বিশ্বের মুসলমানদের ঈমান-আকীদা ও অমূল্য রত্ন চরিত্রকে ইহুদী-খ্রিস্টান, নাস্তিক-মুরতাদ ও মিডিয়া-চক্র বিভিন্ন কলা-কৌশলে টিভি-ভিসিডি, সিনেমা-ইন্টারনেট, পত্রিকা-ম্যাগাজিন এবং অশ্লীল বই-পুস্তক দ্বারা ধ্বংস করার অপচেষ্টা করছিল; বিশেষত আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম– যুবসমাজকে। সুতরাং এই সিরিজ অতুলনীয়। এই সিরিজের প্রশংসা করার ভাষা আমার নেই। শুধু এতটুকু বলতে পারি, আমার মত শত শত বইপ্রেমীকদের হৃদয়ে তার প্রভাব 'খাদ্য মেটায় পেটের ক্ষুধা আর বই মেটায় আত্মার ক্ষুধা' প্রবাদ বাক্যের মতো। প্রিয় লেখক ভাইয়া! আপনি শুনে খুশি হবেন যে, আমি আমার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনকে প্রায় ২৭টির মতো বই উপহার দিয়েছি। তাদের মন্তব্য হলো, অন্ধকার রাতে পথিকের আলোর প্রয়োজন যেমন, তেমনি পথভোলা মানুষের হৃদয়ে জান্নাতের আলো জ্বালাতে হৃদয় গলে সিরিজের প্রয়োজন তেমন। আরও আনন্দের ব্যাপার হলো, আমি এক হিন্দু ভদ্রলোককে ঈমানদীপ্ত কাহিনী ও যে গল্পে হৃদয় খুলে বই দুটি উপহার দিয়েছি। কিছুদিন পর হিন্দু ভদ্রলোক বললেন– 'বই দুটো পড়ে খুবই মুগ্ধ হয়েছি। এ সিরিজ সত্যিই প্রসংশনীয়। এতে জীবনের ঠিকানা খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে করি। ধন্যবাদ।' এজন্য আমি মনে করি, শুধু বাংলা ভাষাভাষী প্রতিটি মুসলিম পরিবারেই নয়, বরং বিশ্বের প্রতিটি পরিবারে এই সিরিজ একান্ত প্রয়োজন। লেখক ভাইয়া! এ পর্যন্ত আমি প্রায় ৬০টি খণ্ড সংগ্রহ করে পড়েছি। প্রায় খণ্ডে দেখিছি, পাঠক-পাঠিকাগণ পরবর্তী সিরিজের নাম প্রস্তাব করেছেন। তাই আমিও কয়েকটি নাম দিলাম। যথা– মধুময় সংসার

[উপন্যাস], সংসার সুখের হয় দু'জনের গুণে, কত যে সুন্দর ইসলাম! পরিশেষে দোয়া করি, হে জগতের অধিপতি! আপনি হৃদয় গলে সিরিজের লেখক মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলামকে হায়াতে তায়্যিবা দান করুন এবং উভয় জগতে উত্তম প্রতিদান দিন। আর একই দোয়া রইল, সিরিজের সাথে সম্পৃক্ত সকল মুসলমান ভাইবোনদের প্রতিও।

হে হৃদয় হলে সিরিজ!
তুমি আমার জান, তুমি আমার প্রাণ
তুমি এ যুগের আশা, তুমি আগামী দিনের ভরসা।
তুমি আমার ভালোবাসা।

– কে. এম. আশরাফুল ইসলাম বিন আব্দুল করিম, কাশীপুর সুরমা, ব্রজেন্দ্রগঞ্জ, শাল্লা, সুনামগঞ্জ।

দৃষ্টি আকর্ষণ

আপনি কি ঘরে বসে
সুলভমূল্যে
হৃদয় গলে সিরিজের
বই পেতে চান?
তাহলে আজই নিচের
যে কোনো
একটি নম্বরে লেখকের সাথে
যোগাযোগ করুন–

০১৯২৩-২২৯০৯৬, ০১৭১২-৭৯২১৯৩

তাম্মাত বিল খাইর

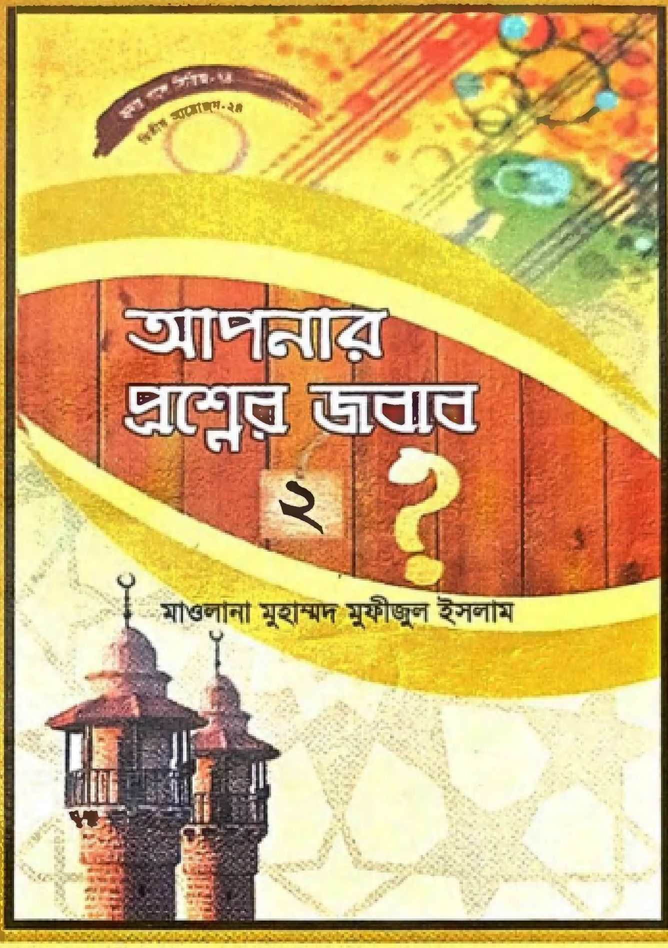

ডিজাইন : পুণ্য-০১৯৮২-৬০৬২৪২

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুত ত্বাকওয়া

১১/১ ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড), বাংলাবাজার, ঢাকা

মোবাইল : ০১৯৬২-৪১৫০৭০